Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মরিয়ম আক্তার

রোলঃ 216020584

১১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মরিয়ম আক্তার

রোলঃ 216020584

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মরিয়ম আক্তার, আইডিঃ 216020584 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Moriam Akter

তারিখঃ

১১ মে, ২০২৪ ইং

(স্বাক্ষর)

মরিয়ম আক্তার

আইডিঃ 216020584

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد

আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে বিশ্ব মানবতাকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এসকল নবী-রাসূলদেরকে গাইডবুক হিসেবে সহীফা ও কিতাব দিয়েছেন। এসব কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে আল -কুরআন। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপরে ঈমান আনা এবং আল -কুরআনকে মেনে চলা মুসলিমদের উপরে আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন। আল -কুরআন এসেছে বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াতের সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

“*রমযান মাস, যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।*” (সূরা আল-বাকারা-১৮৫)

হেদায়াতের এই কিতাব আল -কুরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ করা হয়েছে। আল-কুরআন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)এ-র উপরে দীর্ঘ নবুয়্যতের ২৩ বছর ব্যাপী নাযিলকৃত গ্রন্থ যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে।বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আয়াত এবং সূরা আকারে অবতীর্ণ হয়েছে।এর শব্দ ও ভাব দুটোই আল্লাহর।একজন মুসলিম হিসেবে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।আল-কুরআনুল কারীম মহানবি (সা:)এর উপর আল্লাহ-তায়ালার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরন্তন মুজিযা।এতে রয়েছে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট হেদায়াত ও দিক নিদের্শনা রয়েছে,আলোকবর্তিকা, উপদেশ রহমত ও অন্তরের যাবতীয় ব্যাধির উপশম।

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞

“হে মানুষ!তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থেকে তার শিফা,আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। বল, আল্লাহর অনুগ্রহে ও রহমতে এটি ।সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়।এটি যা তারা জমা করে তার চেয়ে উত্তম। ”(সূরা ইউনুস ৫৬-৫৮)

কুরআনের মতো বিশ্বে দ্বিতীয় আর একটি গ্রন্থ নেই।যার মধ্যে সর্ব প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে।

আল কুরআন কি?

এ প্রশ্নের জবাব স্বয়ং কুরআন কুরআনই দিয়েছেন। কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে- إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ٧٧ فِى كِتَـٰبٍ مَّكْنُونٍ

“নিঃসন্দেহে এটি তো এক সম্মানিত কুরআন, এক সুরক্ষিত গ্রন্থ” (সূরা ওয়াকিয়া : ৭৭-৭৮)

অন্যত্র বলা হয়েছে-قَدۡ جَآءَكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ نُوۡرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيۡنٌ

“নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক আলোক পত্রিকা এবং উন্মুক্ত কিতাব। ”(সূরা মায়িদা:১৫)

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে মানুষের হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূলের মাধ্যমে তার বাণী প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালার ঐ সব বাণীকেই

বলা হয় আসমানী কিতাব। আল-কুরআন, হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল জীবন-যাপন এবং সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। যা আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর তার বানীসমূহ সরাসরি ওহীর মাধ্যমে নাজিল করেছেন। বিশ্বমানবতার চিরন্তন মুক্তির সনদ কুরআন তেলাওয়াত অধ্যয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্যে রয়েছে মানবজাতির কল্যাণ ও সফলতা।
কুরআনের গুরুত্ব তুলে ধরতে মহান আল্লাহ প্রিয় নবী (সা.) কে লক্ষ করে বলেন-

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

“আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বানী ”(সূরা মুজ্জামিল:৫)

হাশরের ময়দানে বান্দার নেক আমল নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, দান- সদকা সব ইবাদতের একটা আকৃতি থাকবে এবং বান্দার জন্য মুক্তির জন্য সেগুলো পথ প্রদর্শক হবে। এ সবের মধ্যে কুরআনের ভূমিকা থাকবে সবচেয়ে বেশি। আল-কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব এবং ওহী। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে কুরআনের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। কেননা কুরআন পৃথিবীর প্রচলিত গতানুগতিক লেখকদের কোন বই বা গ্রন্থ নয়। এর পরিচয় দেওয়া কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়।তাই স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এর পরিচয় দিয়েছেন।

আল্লামা আবুল মা’আলী (রহ) ইমাম মুফতি প্রমুখ কুরআনের ৫৫ টি নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আল কুরআন (সর্বাধিক পঠিত)। আল কুরআন (সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী) আন নুর (আলোক বর্তিকা) , কিতাবুন মুমিন (সুস্পষ্ট ও খোলা কিতাব), হুদান লিন্নাস (মানবতার পথ নির্দেশনা) নি'য়ামত (অনুগ্রহ) রহমত (দয়া) শিফা (আরোগ্য লাভের উপায়) বুরহান (দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টিকারী প্রমান) আযরুল্লাহ (আল্লাহর আদেশ) ইলম (জ্ঞান) আল কাওলুল ফাসলে (চূড়ান্ত মিমাংশাকারী) আল হাকিম (বিজ্ঞানময়) আলোচ্য ভাবসমৃদ্ধ নাম সমূহের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনের পরিচয় তুলে ধরেছেন এতে

কুরআন যে কতো বিস্ময়কর এবং মহিমান্বিত ও গুরুত্বপূর্ণ কালাম তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ওহী কাকে বলে?

ওহী : وحى -এর আভিধানিক অর্থ প্রত্যাদেশ, ঐশী বাণী, অবহিত করা, বার্তা-পাঠানো, আদেশ দেয়া ইলম দান করা। আর পরিভাষায় ওহী বলা হয় : আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে যুগে যুগে স্বীয় নবী রাসূল গণের উপর যেসব আদেশ নিষেধ বা কালাম প্রেরণ করেছেন। তাকেই ওহী বলে। ওহী আবার দু'প্রকার।

এক: প্রকার ওহী হচ্ছে : وحى متلو অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন যার ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ তায়ালার হযরত জীবরাঈল (আ.) যেভাবে পাঠ করে শুনিয়েছেন রাসূল (সা) হুবহু সেভাবেই তা প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয়: প্রকার হচ্ছে وحى غير متلو অর্থাৎ হাদীস। যার ভাব আল্লাহ তায়ালার, কিন্তু রাসূল (সা.) নিজের ভাষায় নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কুরআন এবং রাসূল (সা.)-এর হাদিস উভয়ই ওহী। একটি প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত ওহী, আরেকটি পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত ওহী। আল্লাহ তায়ালা ইসলামের যেসব বিধি-বিধান সংক্ষিপ্তভাবে কুরআনে পেশ করেছেন বা ইংগিত প্রদান করেছেন। রাসূল (সা.) তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি সবিস্তারে হাদীসে বলে দিয়েছেন। সারকথা হচ্ছে রাসূল (সা.)-এর হাদীসগুলোই হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করে নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে হলে হাদীসের ইলম থাকা আবশ্যক। বুখারী শরীফের মধ্যে তিনভাবে ওহী প্রেরণের কথা উল্লেখ থাকলে ও তা আবার অন্য হাদীসের মধ্যে ওহির কয়েকটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ আছে

১. اَلْقَاءُ فِىْ الْقَلْبِ অন্তরে ঢেলে দেয়ার মাধ্যমে ওহী আসত।

২. رُوْيَاصَادَقة সত্যস্বপ্ন।

৩. صِلْصَةُ اَلْجَرِنَس ঘন্টির আওয়াজের সুরতে।

৪. تَمَثَّلُ اَلنَّاس মানুষের রূপধারণ করে।

৫. اَلْمُلْكِ تَمَثَّل ফেরেশতার নিজস্ব আকৃতিতে।

৬. منوراء حجاب পর্দার আড়াল থেকে।

কখনও নবীজীর কাছে দাহইয়াকালবী সাহাবীর রূপ ধারণ করে ফেরেশতা আসতেন।

ওহী নাজিলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কুরআনুল কারিম যেহেতু দুজাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর ওহির মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই ওহি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা জরুরি। প্রতিটি মুসলমানই এ কথা জানে যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পরীক্ষার জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তার উপর বিশেষ কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে গোটা বিশ্বকে তার সেবায় নিয়োজিত করেছেন। তাই দুনিয়ায় আগমনের পর মানুষের জন্য দু'টি কাজ অবধারিত। প্রথমত: তার চারপাশে এ বিশ্বের যা কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো। দ্বিতীয়ত: এ বিশ্বের সৃষ্টরাজিকে ব্যবহার করতে গিয়ে মহান আল্লাহর বিধিনিষেধকে সামনে রাখা। এমন কোনো কাজ না করা, যা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পরিপন্থী হয়।

আর উপরোক্ত দুটি দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মানুষের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। কারণ, বিশ্ব জগতের বাস্তবতা উপলব্ধি করা এবং এ সকল সৃষ্টিরাজির কোনটির কি বৈশিষ্ট্য ও এগুলো দ্বারা উপকৃত হবার পদ্ধতি কি? যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ পৃথিবীর কোনো বস্তুকে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ কথা জানবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি কোন পথে? তিনি কোন কাজটিকে পছন্দ করেন আর কোনটিকে অপছন্দ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পথে কাজ করা অসম্ভব।

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে এমন তিনটি বস্তু দান করে দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে সে উপরোক্ত বিষয়গুলোর জ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রথমত: মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়শক্তি। অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক। দ্বিতীয়ত: মেধা শক্তি ও বিবেক। তৃতীয়ত: ওহি।

অনেক বিষয়ের জ্ঞান মানুষ পঞ্চইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। আবার অনেক বিষয়ের জ্ঞান মেধাশক্তির মাধ্যমে লাভ করে থাকে। আর যে সকল বিষয়ের জ্ঞান এ মাধ্যম দুটি দ্বারা অর্জন করা যায় না, সেগুলাের জ্ঞান ওহির মাধ্যমে দান করা হয়।

জ্ঞান অর্জনের উপরোক্ত তিনটি মাধ্যমের ক্রমধারা কিছুটা এমন যে, প্রত্যেকটির একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা ও বিশেষ পরিধি রয়েছে। এ সীমা ও পরিধির বাইরে মাধ্যমগুলো নিস্ক্রিয়। যেমন, যেসব বস্তুর জ্ঞান মানুষ পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জন করে, নিছক মেধাশক্তি দ্বারা সেগুলোর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ, এ মুহূর্তে আমার সামনে একজন লোক বসে আছে। আমার দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে, সে একজন মানুষ। আমার চোখই আমাকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তার রঙ ফর্সা, কপাল প্রশস্ত, চুলগুলো কালো, ঠোঁট দুটো হালকা এবং চেহারা সুন্দর। যদি এ বিষয়গুলোর জ্ঞান নিজের পঞ্চ ইন্দ্রিয়শক্তি বাদ দিয়ে শুধু

মেধাশক্তির মাধ্যমে লাভ করার চেষ্টা করা হয়, যেমন চোখ দুটি বন্ধ করে ওই ব্যক্তির গায়ের রঙ, শারীরিক গঠন-প্রকৃতি ও গোটা দেহের কথা কল্পনা করা হয় তাহলে আদৌ সে এসব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারবে না। ঠিক অনুরূপভাবে যেসব বস্তুর জ্ঞান মেধাশক্তির মাধ্যমে লাভ হয়, সেগুলো নিছক পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন, আলোচিত ব্যক্তির ব্যাপারে আমার এ কথাও জানা আছে যে, তার কোনো না কোনো একজন মা অবশ্যই আছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমার জানা আছে যে, তার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। যদিও এ মুহূর্তে আমার সামনে না আছে তার মা আর না দেখি আমি তার সৃষ্টিকর্তাকে। কিন্তু আমার বিবেক ও মেধাশক্তি আমাকে জানান দিচ্ছে যে, এ ব্যক্তি নিজে নিজেই সৃষ্টি হতে পারে না। আমি যদি এখানে আমার বিবেক ও মেধাশক্তিকে বাদ দিয়ে নিজের চোখ বা দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে তার মা ও তার সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে বেড়াই, তাহলে এ বস্তুর জ্ঞান অর্জন করা কখনো সম্ভব হবে না। কারণ তাকে সৃষ্টি করার দৃশ্য এ মুহূর্তে আমার চোখের সামনে আসা সম্ভবপর নয়। মোটকথা, যে পর্যন্ত পঞ্চইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক রয়েছে, সে পর্যন্ত বিবেক ও মেধাশক্তি কোনো দিক-নির্দেশনা দিবে না। যেখানে গিয়ে পঞ্চ ইন্দ্রিয়শক্তি অক্ষম হয়ে পড়ে, সেখান থেকে বিবেক ও মেধাশক্তির কার্যক্রম আরম্ভ হয়। কিন্তু এই বিবেক ও মেধা শক্তির দিক-নির্দেশনাও নির্দিষ্ট সীমার বাইরে নয়। বরং নির্দিষ্ট একটি সীমায় গিয়ে সে থেমে যায়। এমন অনেক বস্তু আছে, যেগুলোর জ্ঞান না পঞ্চইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে অর্জন করা যায় আর না বিবেক ও মেধাশক্তি দ্বারা। যেমন, আলোচিত ব্যক্তির ব্যাপারে বিবেক ও মেধাশক্তি তা বলে দিয়েছে যে, তার একজন স্রষ্টা রয়েছেন, কিন্তু ওই ব্যক্তিকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? তাকে সৃষ্টির পেছনে কী উদ্দেশ্য? আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে তার উপর কী কী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে? তার কোন কাজ আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় আর কোন কাজ অপছন্দনীয়? ইন্দ্রিয়শক্তি ও মেধাশক্তি যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালালেও এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। মানুষকে এই প্রশ্নাবলীর জবাব দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তার নামই হলো ওহি বা প্রত্যাদেশ। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ওহি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে

মানুষের জ্ঞান অর্জনের সর্বোচ্চ মাধ্যম। তার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সেসব প্রশ্নাবলীর জবাব সরবরাহ করে থাকে, ইন্দ্রিয়শক্তি ও মেধাশক্তির মাধ্যমে যে গুলোর সমাধান সম্ভব হয় না। তাই ওহির জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া মানুষের কোনো উপায় নেই। উল্লিখিত ব্যাখ্যা দ্বারা এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, মানুষের দিক- নির্দেশনার জন্য কেবল ইন্দ্রিয়শক্তি ও মেধাশক্তিই যথেষ্ট নয় বরং তার হেদায়াত ও দিক-নির্দেশনার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত ওহির জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। আর যেহেতু ওহির দিক-নির্দেশনার সূচনাই হয় সেখান থেকে, যেখানে বিবেক ও মেধাশক্তি অকার্যকর, কাজেই ওহির প্রত্যেকটি বিষয়ই বিবেক ও মেধাশক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যাবে এমনটি আবশ্যক নয়। যেভাবে কোনো বস্তুর রঙ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা বিবেক ও মেধাশক্তির কাজ নয় বরং ইন্দ্রিয় শক্তিই তার জন্য যথেষ্ট। তদ্রুপ দীনি আকিদাগত অনেক বিষয় রয়েছে, যে গুলোর জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি শুধুমাত্র ওহির উপরই নির্ভর করে। কাজেই সেগুলো উপলব্ধি করার জন্য শুধু বিবেক ও মেধাশক্তির উপর নির্ভর করা ঠিক নয়।

সারকথা হলো, ওহি এমন একটি মাধ্যম, যার দ্বারা মহান আল্লাহ তায়ালা তার নির্দেশাবলী নিজের কোনো বান্দা ও রাসূলগণের প্রতি প্রেরণ করেন এবং সেই মনোনীত রাসুলের মাধ্যমে সমগ্র জাতির নিকট পৌঁছিয়ে দেন। ওহির শিক্ষা হচ্ছে, এর মাধ্যমে বান্দাদেরকে ওইসব বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হয়, যা তার নিছক নিজেদের ইন্দ্রিয়শক্তি ও মেধাশক্তির মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম হয় না। সে বিষয়গুলো নিরেট যেমন ধর্মীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত হতে পারে, তেমনি হতে পারে পার্থিব প্রয়োজন সংক্রান্ত। নবী-রাসুলগণের ওহি সাধারণত প্রথম প্রকারের হয়ে থাকে। তবে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পার্থিব প্রয়োজনীয় বিষয়ও ওহির মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।

ওহীর সূচনা কিভাবে হয়েছিল

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহীর সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, হুজুর ঘুমের ঘোরে এমন

বাস্তব স্বপ্ন দেখতে থাকেন যা উজ্জ্বল প্রভাতের ন্যায় বাস্তবায়িত হতে থাকে। অতঃপর হুজুরের নিকটে নির্জনবাস আকর্ষণীয় অনুভূত হল এবং তিনি হেরা গুহায় নির্জনবাস শুরু করে দিলেন। এখানে তিনি একাধিক রাত্রি একত্রে কাটিয়ে দিতেন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য পানীয় ও জরুরী সামগ্রী সাথে নিয়ে যেতেন। উহা ফুরিয়ে গেলে আবার ফিরে এসে হযরত খাদীজার নিকট হতে উহা নিয়ে গুহায় ফিরে যেতেন। এভাবেই এক শুভক্ষণে হেরায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁর কাছে হকের (ওহীর) আগমন ঘটল। ফিরিশতা (জীবরাঈল আমিন) এসে তাঁকে বললেন, আপনি পড়ুন। (হুজুর বলেন) আমি বললাম, আমি পাঠক নই। হুজুর বলেন, অতঃপর ফেরেশতা আমাকে বগলে দাবিয়ে ছেড়ে দিলেন। ফলে আমি খুব ক্লান্তি বোধ করতে থাকলাম। আবার তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিলেন। এভাবে তিনি তিনবার করলেন এবং তিনবারই হুযুর একই জওয়াব দিলেন। অতঃপর ফেরেশতা পাঠ করলেনঃ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“*তুমি পাঠ কর তোমার সেই প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে ঘণীভূত রক্ত বিন্দু হতে। তুমি পাঠ কর তোমার সেই মহিমান্বিত প্রভূর নামে যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানব জাতিকে শিখিয়ে দিয়েছেন যা সে জানত না*”। (সূরা আলাক আয়াত নং ১-৫)

অতঃপর হুজুর উক্ত আয়াতসমূহ নিয়ে কম্পিত হৃদয়ে বাড়ি ফিরলেন। আর খাদীজা (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। এভাবে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়ার কিছুক্ষণ পরে তাঁর অস্থিরতা কেটে গেল। তিনি হযরত খাদীজাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শুনালেন এবং বললেন, আমার নিজের জীবন সম্পর্কেই আমার ভয় হচ্ছে। হযরত খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ কিছুতেই আপনার কোন অনিষ্ট করবেন না। কেননা আপনি

আত্মিয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দরিদ্র ও নিরন্নকে সাহায্য করেন, অতিথীদের সেবা করেন এবং উত্তম কাজের সাহায্য করেন। অতঃপর হযরত খাদীজা হুজুরকে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারকা বিন নওফলের কাছে গেলেন। তিনি জাহেলিয়াতে ইসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইবরাণী ভাষা জানতেন। আর ইনজিল হতে উক্ত ভাষায় যা ইচ্ছা নকল করতে পারতেন। তিনি খুবই বৃদ্ধ ছিলেন এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। খাদীজা তাকে সম্বোধন করে বললেন, ভাই আপনি আপনার ভাইপোর ঘটনা শুনুন, তিনি বললেন, এতো সেই ফেরেশতা যিনি হযরত মুসার (আঃ) কাছে এসেছিলেন। আফসোস! তোমার লোকেরা তোমাকে যখন দেশ হতে বের করে দিবে, তখন যদি আমি জীবিত থাকতাম! হুজুর বললেন, তাহলে কি তারা আমাকে বের করে দিবে? ওয়ারকা বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা পেয়েছ ইহা যে পেয়েছে তার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। আমি যদি ঐ দিন জীবিত থাকি, তাহলে তোমাকে সাধ্যমত সাহায্য করব। অতঃপর পুনরায় ওহী নাযিলের আগেই ওয়ারকা ইনতেকাল করেন।

উপরোক্ত ঘটনাটি যেদিন ঘটে সেদিন ছিল ১৭ই রমজান সোমবার। হুজুরের বয়স ছিল তখন চল্লিশ বছর ছয় মাস আট দিন। অর্থাৎ ৬ই আগস্ট ৬১০ খৃস্টাব্দ।

কুরআন নাজিলের কারণ

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষনের পরে আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-কে বেহেশ্‌ত হতে দুনিয়ায় পাঠানোর প্রাক্কালে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলে দিয়েছিলেন যে, قُلْنَا اهْبِطُوْا

مِنۡهَا جَمِیۡعًا ۚ فَاِمَّا یَاۡتِیَنَّکُمۡ مِّنِّیۡ هُدًی فَمَنۡ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَ لَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ
وَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا وَ کَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَاۤ اُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ

"তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে পড়। অতঃপর তোমাদের কাছে আমার পক্ষ হতে জীবন বিধান যেতে থাকবে পরন্তু যারা আমার জীবন বিধান অনুসারে চলবে, তাদের ভয় ও চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। (অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তিতে তারা আবার অনন্ত সুখের আধার এই বেহেশতেই ফিরে আসবে)। আর যারা উহাকে অস্বীকার করে আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে"। (সূরা বাকারা আয়াত নং ৩৮,৩৯)

আল্লাহ তায়ালার উক্ত ঘোষণা মোতাবেকই যুগে যুগে আদম সন্ততির কাছে আল্লাহর তরফ হতে হেদায়েত বা জীবন বিধান এসেছে। এই জীবন বিধানেরই অন্য নাম কিতাবুল্লাহ। যখনই কোন মানব গোষ্ঠী আল্লাহর পথকে বাদ দিয়ে নিজেদের মন গড়া ভ্রান্ত পথে চলতে থাকে, তখনই কিতাব নাযিল করে আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন।

কিতাব নাজিলের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন নীতি হল এই যে, তিনি যখন কোন জাতির জন্য কিতাব নাজিলের প্রয়োজনীয় অনুভব করেন, তখনই সেই জাতির মধ্য হতে মানবীয় গুণের অধিকারী সর্বোৎকৃষ্ঠ লোকটিকে পয়গাম্বর হিসেবে বাছাই করে নেন, অতঃপর ওহীর মাধ্যেমে তার উপরে কিতাব নাজিল করে থাকেন।

মানব সৃষ্টির সূচনা হতে দুনিয়ায় যেমন অসংখ্য নবী-রসূল এসেছেন, তেমনি তাঁদের উপরে নাযিলকৃত কিতাবের সংখ্যাও অগণিত। নবীদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যেমন সর্বশেষ কিতাব। অতঃপর দুনিয়ায় আর কোন নতুন নবীও আসবে না এবং কোনও নতুন কিতাবও অবতীর্ণ হবে না।

পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিকথা

আল-কুরআন বিশ্বের বিস্ময়কর গ্রন্থ। কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো - এ গ্রন্থ দুইবার নাজিল হয়েছে প্রথমে একবার পুরো কুরআনের আয়াত প্রথম আসমানে 'বাইতুল ইজ্জতে ' নাযিল হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৩ বছর ধরে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে, যুগ-জিজ্ঞাসার জবাবে নাযিল হয়েছে। কুদরতি নিয়মে হাজারো বছর ধরে অত্যন্ত বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় এ গ্রন্থকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লিখে রাখার পাশাপাশি হাজারো বছর ধরে হৃদয় থেকে হৃদয়ে একে ধারণ করা হয়েছে।

রাসুল (সা.)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ :

যেহেতু পূর্ণ কুরআন একসাথে নাজিল হয়নি বরং কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বিশেষ প্রয়োজনীয় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই রাসূল (সা.) এর যুগে শুরু থেকেই বই আকারে একে সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। আসমানী গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের এ বিশেষত্ব দান করেছেন যে কলম কাগজের চেয়ে ও একে অগনিত সংখ্যক হাফেজের স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেছেন। কুরআনকে মানুষের অন্তরে অন্তরে এভাবে সংরক্ষণ করা হবে যে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কোন আশংকাই থাকবে না। তাই প্রথম দিকে লেখার চেয়ে কুরআন মুখস্ত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।ফলে রাসুল (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় অংশ হাফেজে কুরআন হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন-হজরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, সাআদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুজায়ফা বিন ইয়ামান, হজরত সালেম, আবু হুরায়রা, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আমর ইবনুল আস, আবদুল্লাহ বিন আমর, মুয়াবিয়া, ইবনে জুবাইর, আবদুল্লাহ বিন আস্ সায়েব, আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালমা, উম্মে ওয়ারাকা, উবাই ইবনে কাআব, মাআজ ইবনে জাবাল, আবু হুলাইমা মাআজ, জায়েদ ইবনে সাবেত, আবুদ্ দারদা, মুজাম্মা বিন জারিয়া, মাসলামা বিন মুখাল্লিদ,

আনাস ইবনে মালেক, উকবা বিন আমের, তামিম দারেমি, আবু মুসা আশআরি এবং হজরত আবু জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ অন্যতম হাফেজ সাহাবি ছিলেন। (আল-ইত্বকান, খ. ১, পৃ. ৭৩-৭৪)

মূলত উল্লিখিত নামগুলো সেসব সাহাবির, যাঁদের নাম হাফেজে কুরআন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। অন্যথায় আরো অগণিত সাহাবির গোটা কুরআন মুখস্থ ছিল। কেননা বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) কখনো কখনো এককে গোত্রে সত্তরজন করে কুরআনের শিক্ষক পাঠাতেন। বিরে মাউনার যুদ্ধে সত্তরজন কারি সাহাবি শহীদ হওয়ার কথা বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। হাফেজ সাহাবির সংখ্যা এতই বেশি যে ইমামার যুদ্ধে প্রায় সমসংখ্যক হাফেজ, আরেক বর্ণনা মতে, পাঁচ শ (ইবনে কাছির, খ. ১, পৃ. ২৬), অন্য বর্ণনামতে, সাত শ কারি/হাফেজ সাহাবি শহীদ হয়েছেন। (উলুমুল কোরআন, পৃ. ১৭৬)

রাসুল (সা.)-এর যুগে কুরআন সংকলন :

আরবদের দুনিয়াজুড়ে খ্যাত বিস্ময়কর স্মৃতির ওপর ভর করে কুরআন সংরক্ষণের পাশাপাশি রাসুল (সা.) লিখিতভাবে কুরআন সংকলন, সংরক্ষণ ও একত্রীকরণের ব্যবস্থা করে গেছেন। ওহির ইলম লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনি চল্লিশজন 'কাতেবে ওহি' বা ওহি লেখক নিযুক্ত করেছেন। সে সময় কাগজ ছাড়া ও পাথর, চামড়া, খেজুরের ডাল, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা, হাড়ের উপর কুরআন লিখে রাখা হতো। এভাবেই রাসূল (সা.) এর তত্ত্বাবধানে কুরআনের একটি কপি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, যদিও তা পুস্তিকার রূপে ও গ্রন্থিত আকারে ছিলো না। এ ছাড়া সাহাবায়ে কেরামের কারো কারো কাছে ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ কপি বিদ্যমান ছিল। যেমনটা বুখারি শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, 'রাসুল (সা.) কুরআন নিয়ে (অর্থাৎ কুরআনের কপি নিয়ে) শত্রুদের ভূখণ্ডে সফর করতে নিষেধ করেছেন।' (বুখারি শরিফ, খ. ১, পৃ. ৪১৯)

আবু বকর (রা.)-এর যুগে কুরআন সংকলন :

যেহেতু রাসুল (সা.)-এর যুগে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন বস্তুর ওপর কুরআন সংরক্ষিত ছিল, তাই হযরত আবু বকর (রা.) নিজ খেলাফতের সময় বিক্ষিপ্ত অংশগুলো একত্র করে সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে সহিহ বুখারি শরিফে। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন, ''ইমামার যুদ্ধের পরপরই হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখি ওমর (রা.)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর (রা.) আমাকে বললেন-ওমর (রা.) এসে আমাকে বলেছেন, 'ইমামার যুদ্ধে কুরআনে হাফেজদের একটি বড় অংশ শহীদ হয়ে গেছে। আর এভাবেই যদি বিভিন্ন স্থানে কুরআনের হাফেজরা শহীদ হতে থাকেন, তাহলে আমার আশঙ্কা হয়, কুরআনের একটি বড় অংশ হারিয়ে যাবে। তাই আমার অভিমত হলো, আপনি চাইলে কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিতে পারেন।' আমি তাঁকে বললাম, 'যে কাজ রাসুল (সা.) করেননি, সেই কাজ আমি কিভাবে করব?' জবাবে ওমর (রা.) বললেন, 'আল্লাহর কসম, এ কাজ উত্তমই উত্তম। এরপর ওমর (রা.) বারবার আমাকে একই কথা বলতে লাগলেন। একপর্যায়ে এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আমার অন্তর খুলে দিলেন। এখন ওমরের অভিমত যা, আমার অভিমতও তা-ই।' এরপর আবু বকর (রা.) আমাকে বললেন, 'তুমি বিচক্ষণ যুবক, তোমার ব্যাপারে আমাদের কোনো খারাপ ধারণা নেই। রাসুল (সা.)-এর জীবদ্দশায় তুমি ওহি লেখার কাজ করতে। তাই তুমিই কুরআনের আয়াতগুলো অনুসন্ধান করে সেগুলো একত্র করো।' যায়েদ (রা.) বলেন, 'আল্লাহর কসম, তাঁরা যদি আমাকে সস্থান থেকে কোনো পাহাড় সরানোর আদেশ দিতেন, তাহলে তা আমার কাছে এত কঠিন মনে হতো না, যতটা কঠিন মনে হয়েছে কুরআন সংকলনের দায়িত্ব পালনের নির্দেশটি।' আমি বললাম, 'আপনারা এমন কাজ কিভাবে করবেন, যা রাসুল (সা.) করেননি?' আবু বকর (রা.) বললেন, 'আল্লাহর কসম, এ কাজে মঙ্গলই রয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বারবার তা বলতে লাগলেন। একপর্যায়ে এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিলেন, যে বিষয়ে বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)-কে। অতঃপর আমি কুরআনের আয়াত অনুসন্ধান করতে

লাগলাম। মানুষের হৃদয় থেকে খুঁজে খুঁজে আমি তা একত্র করলাম। সুরা তওবার শেষ আয়াত আবু খুজাইমা আনসারি (রা.)-এর কাছে পেলাম, অন্যদের কাছে (লিখিতভাবে) তা আমি পাইনি'।" (বুখারি শরিফ, হা. ৪৯৮৬; ইবনে কাছির : ভূমিকা) তবে নিঃসন্দেহে সে আয়াতটি হাফেজ সাহাবিদের মুখস্থ ছিল এবং সেটি 'মুতাওয়াতির' বর্ণনা দ্বারাও কুরআনের আয়াত হওয়া প্রমাণিত। (উলুমুল কোরআন, তকি্ব উসমানি, পৃ. ১৮৫) এ পান্ডুলিপিকে 'মাসহাফুল ইমাম' বলা হয়।

হযরত যায়েদের (রা.) কুরআন সংকলনের পদ্ধতি :

হযরত যায়েদ (রা.) নিজে কুরআনে হাফেজ হওয়া সত্ত্বেও এককভাবে কুরআন সংকলনের গুরুদায়িত্বটি আঞ্জাম দেননি, বরং তিনি চারটি পদ্ধতিতে কুরআন সংকলন করতেন। এক. কোনো আয়াত পাওয়া গেলে সর্বপ্রথম তা নিজের হিফজ ও মুখস্থের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন। দুই. হযরত ওমর (রা.)ও হাফেজ ছিলেন। বর্ণিত আছে যে তিনিও আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে যায়েদ (রা.)-কে সহযোগিতা করতেন। তিন. কোনো আয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা হতো না যতক্ষণ না দুজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দিতেন যে এ আয়াত রাসুল (সা.)-এর সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অথবা সেগুলো রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর আগে তাঁর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুরা তাওবার শেষ আয়াতটি যখন কেবল হযরত আবু খুজাইমা (রা)-এর কাছে পাওয়া গেছে তখন এ সূত্রে সেটিকে গ্রহণ করা হয়েছে যে জীবদ্দশায় রাসুল (সা.) সে সাহাবির একজনের সাক্ষ্যকে দুজনের সাক্ষ্যের সমতুল্য ঘোষণা করে গেছেন। চার. অবশেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে সে আয়াতগুলোর সমষ্টিকে বিভিন্ন সাহাবির ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত কুরআনের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হতো।

হযরত আবু বকর (রা.) সংকলিত কুরআনের বৈশিষ্ট্য :

আবু বকর (রা.) সংকলিত কুরআনকে পরিভাষায় 'উম্ম' বা আদি কুরআন বলা হয়। কেননা এটিই প্রথম লিখিত সুবিন্যস্ত কুরআন। এর বৈশিষ্ট্য হলো-এটি রাসুল

(সা.) বর্ণিত ধারাক্রম অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে। সুরাগুলো আলাদা রেখে দেওয়া হয়েছে; সুরার ক্রমধারা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। এটি সাত হরফ বা সাত কেরাতে লেখা হয়েছে। এ কপিটি হীরার হস্তাক্ষরে লেখা হয়েছে। এখানে কেবল সেসব আয়াত লেখা হয়েছে, যেগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়নি। এই সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল একটি সুবিন্যস্ত, গ্রন্থিত কুরআনের কপি সংগ্রহ করা, যাতে প্রয়োজনের সময় এর দ্বারস্থ হওয়া যায়। এটি ১৩ হিজরিতে শুরু হয়ে পূর্ণ এক বছর মতান্তরে প্রায় দুই বছরে সমাপ্ত হয়। (তারিখুল কোরআনিল কারিম, তাহের আল কুরদি; খ. ১, পৃ. ২৮)

হযরত আবু বকর (রা.) সংকলিত কুরআনটি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিল। এরপর উমর (রা.)-এর কাছে। তাঁর শাহাদাতের পর নিজ অসিয়ত মোতাবেক রাসুল (সা.)-এর স্ত্রী, নিজ কন্যা হাফসা (রা.)-এর কাছে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর মারওয়ান বিন হাকাম তাঁর রাজত্বকালে এ কপিটি চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। হাফসা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর মারওয়ান এ কপি হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কাছ থেকে নিয়ে যান। অতঃপর তিনি এ চিন্তা করে সেটি জ্বালিয়ে দিয়েছেন যে উসমান (রা.)-এর খেলাফত আমলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তুতকৃত কপির সঙ্গে এর কেরাতের পার্থক্যের কারণে অদূর ভবিষ্যতে ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে কেননা উসমান (রা.) সাত কেরাতের পরিবর্তে এক কেরাত, আঞ্চলিক একাধিক ভাষার পরিবর্তে প্রমিত এক ভাষায় সে কুরআনটি সংকলন করেছেন। (উলুমুল কুরআন, তক্বি উসমানি, পৃ. ১৮৬-১৮৭)
এটাই মাসহাফে উসমানী নামে পরিচিত।

আল - কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও অবতীর্ণের মূল উদ্দেশ্য

প্রত্যেক কাজের'ই কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কাজ'ই হয় না। আল্লাহ তায়া'লা হলেন মহা কৌশলী। কোন হিকমত ছাড়া তিনি পবিত্র

কুরআন অবতীর্ণ করেননি।কুরআনের আলোচ্য বিষয় হল, মানব জাতি। কেননা মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক পরিচয়ই কুরআনে দান করা হয়েছে। কুরআনের উদ্দেশ্য হল মানব জাতিকে খোদা প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার দিকে পথ প্রদর্শন, যাতে সে দুনিয়ায়ও নিজের জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং পরকালেও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হতে পারে। নিম্নে কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হলো :

১. সঠিক পথ নির্দেশনা : কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদের ঘোষণা। দিশেহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দানের নিমিত্তে আল্লাহ তায়া’লা আল- কুরআন অবতীর্ণ করেন।

২. সমস্যার সমাধান : বিশ্বমানবতা যখন চরম সমস্যায় জর্জরিত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত। যখন বিশ্ব মানবতা আশা করছিল ওপরের ফয়সালা ঠিক তখনই আল্লাহ তায়া’লা সব সমস্যার সমাধান আলোক বর্তিক রূপে কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ করেন।

৩. সতর্কতা বার্তা প্রদান : কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত সব নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পাশাপাশি অতীতের হটকারী জাতিগুলোর ভুলের শোচনীয় পরিণায় সমূহ উল্লেখের মাধ্যমে মানব সমাজকে সতর্কতা প্রদানের নিমিত্তে আল- কুরআন অবতীর্ণ হয়।

৪. ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোধন: ইসলাম পূর্ব আরব সমাজের লোকেরা বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদা পোষন করত। নিজেদের মনমত বিধান তৈরি করে জীবন অতিবাহিত করত। তারা ছিল চরম কুসংস্কার আচ্ছন্ন। তাদের সে ভ্রান্ত ধ্যান,ধারণা খন্ডনের নিমিত্তে কুরআন অবতীর্ণ হয়।

৫. ইসালামী সমাজের রূপরেখা প্রণয়ন : মানব রচিত সব মতাদর্শ উৎখাত করে ইসলামি সমাজের বাস্তব রূপরেখা প্রণয়ন তথা কুরআনের বিধান কায়েম করা। বস্তুত এটাই ছিল কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য।

৬. শিরক মুক্ত সমাজ গঠন : আল- কুরআন নাজিলের পূর্বে মানবতাছিল জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শিরক,কুফর আর নিফাকিতে সয়লাব ছিল মানব সমাজ। কুরআন এসেই বিশ্ববাসীকে এসব মুনকার কাজ থেকে মুক্ত করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ নির্দেশ প্রদান করে।

৭. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা: অন্যায়, জুলুম- অত্যাচার মানবাধিকার লংঘনে বিশ্বমানবতা অস্থির। আর এজন্য দরকার ন্যায় ও ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কুরআন নাজিলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা।

৮. রবের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন : প্রতিটি মুমিনের'ই একান্তকামনা থাকে তার মনিবের সঙ্গে সাক্ষাত লাভ।কুরআন এ কামনা পূরণে পথনির্দেশ হিসেবে অবতীর্ণ করেছে।

৯.সত্যায়নকারী:সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব হলো   আল-কুরআন।এর পূর্বে অনেক আসমানী কিতাব ও অগনিত নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন।কুরআন এসে পূর্ববর্তী নবী-রাসুল সহ আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করেছে।

১০.তাজকিয়ায়ে নফস:সর্বোপরি দুনিয়ার সব কর্মকাণ্ডে বান্দার আত্মশুদ্ধি লাভে কুরআন এক কার্যকারী টনিক হিসেবে অবতীর্ণ হয়।

আল- কুরআনের বৈশিষ্ট্য

আল-কুরআন পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দী এক নির্ভেজাল মহাগ্রন্থের নাম। যার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।কোন ব্যক্তি অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারবে তার ভাষা শৈলী ও ব্যাপকতা কতটা গভীরে।এই মহাগ্রন্থের কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে -

১.আল্লাহর কালাম:আল্লাহ তায়ালার কথামালার নির্ভেজাল সমাহার হলো আল্লাহর কালাম।যাতে কারো মনভাঙা কিচ্ছা,কাহিনী ও পরিবর্তনের বিন্দু পরিমাণ সুযোগ নেই।প্রতিটি শব্দ বাক্য মানব জন্য উপদেশ।আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- وَ تَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّکَ صِدۡقًا وَّ عَدۡلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمٰتِهٖ ۚ وَ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ

“সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ।তার বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই।” (সূরা আনআম-১১৫)

২.কুরআন পরিপূর্ণ জীবন বিধান:

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্য এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য যুগে যুগে আসমানী কিতাব পাঠিয়েছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ পরিপূর্ণ জীবন বিধান। বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সব সমস্যার সমাধান হিসেবে ইহা অবতীর্ণ।এরপর আর কোন আসমানী কিতাবের অবতীর্ণের প্রয়োজনীয়তা নেই।কারণ,এ গ্রন্থে মানব জীবনের ইহকালীন ও পরকালীন সমস্ত বিষয় উল্লেখ রয়েছে।আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,وَنَزَّلۡنَا عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ تِبۡیَانًا لِّکُلِّ شَیۡءٍ

“*তোমার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি,যার মধ্যে সকল বিষয়ের বর্ণনা আছে।’*(সূরা নাহল-৮৯)

আর ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনে ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, اَلۡیَوۡمَ اَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ وَ اَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِیۡ وَ رَضِیۡتُ لَکُمُ الۡاِسۡلَامَ دِیۡنًا ؕ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থারূপে ইসলামকে মনোনিত করলাম।"(সূরা-আল মায়িদা:৩)

৩.সহজ প্রকৃতি:আল-কুরআনের ভাষা সহজ প্রকৃতির তা বুঝতে হলে পড়তে হবে আধুনিক যুগের মানবরচিত আরবি কিতাবগুলো। আল-কুরআনের মতো পৃথিবীর দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ এভাবে মানুষ মুখস্থ করতে দেখেনি।দেখাও যায়নি।কুরআনের তিলওয়াতকে যেমন সহজ করেছেন।এ-র মর্মবাণী বোঝার ক্ষেত্রেও সহজ করেছেন।মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-فَاِنَّمَا يَسَّرۡنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُوۡنَ

"আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি।যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।"(সূরা দুখান:৫৮)

৪.অপ্রতিদ্বন্দীতা:কুরআনের মতো আর কোনো গ্রন্থ পৃথিবীতে নেই যে অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে যে তার মতো একটি আয়াত বা একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসতে।আল্লাহ তায়ালা বলেন- قُلۡ لَّئِنِ اجۡتَمَعَتِ الۡاِنۡسُ وَ الۡجِنُّ عَلٰۤی اَنۡ یَّاۡتُوۡا بِمِثۡلِ هٰذَا الۡقُرۡاٰنِ لَا یَاۡتُوۡنَ بِمِثۡلِهٖ وَ لَوۡ کَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ ظَهِیۡرًا

"আপনি তাদের বলে দিন সমগ্র মানব আর জিন জাতি একত্রিত হয়ে এ কুরআনের মতো একখানা কিতাব রচনা করার জন্য প্রচেস্টা চালায়।তবুও তারা তা আনতে সক্ষম হবে না,যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে এ কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে।"(সূরা ইসরা-৮৮)

৫.চিরস্থায়ী:এ কিতাব স্থায়িত্বের গুনে গুনানিত।কোন জাতি গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়নি।কারণ এর সংরক্ষনের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন।আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّکۡرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ

“*নিশ্চয়ই আমিই কুরআন করেছি আর অবশ্যই আমি এর সংরক্ষক।*”(সূরা হিজর-৯)

৬.ব্যাপকতা:কুরআন বক্তব্যের মধ্যে সব যুগের সব মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে।আল্লাহ তায়ালা বলেন-اِنۡ هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعٰلَمِيۡنَ

“*এ কুরআন হচ্ছে বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ সংবলিত গ্রন্থ।*”(সূরা তাকভির-২৭)

আল্লাহ তার রাসূলকে সম্মোধন করে অন্য আয়াতে বলেন- وَ نَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ تِبۡيَانًا لِّكُلِّ شَيۡءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحۡمَةً وَّ بُشۡرٰى لِلۡمُسۡلِمِيۡنَ

“*আমি আপনার প্রতি এ কিতাব নাজিল করেছি,যাতে রয়েছে প্রতিটি মানুষের জন্য সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।এছাড়াও রয়েছে সত্যের পথনির্দেশনা।রহমত এবং আত্মর্সমপন কারীদের জন্য সুসংবাদ।*”(সূরা নাহল-৮৯)

৭.কুরআন নির্ভুল ও অতীব গ্রন্থ:কুরআন গোটা মানব জাতির জন্য আল্লাহর দেওয়া পথ-নিদেশ এবং নির্ভুল ও অতীব বিশুদ্ধ গ্রন্থ।পূর্ব্বর্তী নবী-গণের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবসমূহ কালক্রমে সে জাতির পাপীষ্ট লোকেরা নিজেদের সুবিধামতো পরিবর্ধন করে পরিবর্তন করেছে।আল-কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এইযে,এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ গ্রন্থ।এটা তার চিরন্তন বাণী।এর মধ্যে সন্দেহের কোন লেশমাত্র নেই। পবিত্র কুরআনে এ সম্মন্ধে বলা হয়েছে-

ذٰلِكَ الۡكِتٰبُ لَا رَيۡبَ ۛۚ فِيۡهِ ۛۚ هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ

“*এটা এমন কিতাব,যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।*”(সূরা আল বাকারা-২)

কুরআন অপরিবর্তনীয় আসমানী কিতাব এর পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই।এ প্রসজ্ঞে আল্লাহ বলেন-

وَ اتۡلُ مَاۤ اُوۡحِیَ اِلَیۡکَ مِنۡ کِتَابِ رَبِّکَ ۚؕ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمٰتِہٖ ۚ۟ وَ لَنۡ تَجِدَ مِنۡ دُوۡنِہٖ مُلۡتَحَدًا

"*তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার প্রতি যে ওহি নাযিল করা হয়েছে তা তিলাওয়াত কর।তার কথা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারও নেই।"(*সূরা কাহাফ-২৭)

قُلۡ مَا یَکُوۡنُ لِیۡۤ اَنۡ اُبَدِّلَهٗ مِنۡ تِلۡقَآیِٔ نَفۡسِیۡ ۚ اِنۡ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوۡحٰۤی اِلَیَّ ۚ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اِنۡ عَصَیۡتُ رَبِّیۡ عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ

"*আপনি বলে দিন যে,আমি নিজের পক্ষ থেকে এ কিতাব পরিবর্তন করার অধিকারী নই। আমি শুধু ওহির অনুসরণ করি।যা আমার প্রতি নাজিল হয়।*"(সূরা ইউনুস-১৫)

لَّا یَاۡتِیۡهِ الۡبَاطِلُ مِنۡۢ بَیۡنِ یَدَیۡهِ وَ لَا مِنۡ خَلۡفِهٖ ؕ تَنۡزِیۡلٌ مِّنۡ حَکِیۡمٍ حَمِیۡدٍ

"*এ কিতাব অতীব মজবুত সুরক্ষিত কিতাব।না তার সামনে থেকে মিথ্যা ঢুকতে পারে আর না পিছন থেকে। এটা নাজিল হয়েছে সুবিজ্ঞ স্বপ্রশসিত আল্লাহর নিকট থেকে।*"(সূরা হা-মিম আস-সাজদা-৪২)

৮.চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় উত্তীর্ন গ্রন্থ:যখন এ গ্রন্থ হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর উপর অবতীর্ণ হয় তখন ছিল ব্যাপক সাহিত্য চর্চার যুগ।তাই আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের কলম স্তম্ব করে দিয়েছে।আরবের লোকেরা কুরআনের ভাষার বিশুদ্ধতা,ভাষা অলংকার,রচনাশৈলী, বলিষ্ঠ যুক্তিধারা, অনুপম বিন্যাস ও ভাষার মাধুর্যে বিমোহিত ও কুরআনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের দিকে ধাবিত হতে শুরু করল।তখন কতিপয় ইসলাম বিদ্বেষী কপট মুনাফিক

জিদের বর্শবতী হয়ে একে কবিতা ও যাদু বলে নানা অপবাদ দিতে থাকে।এমনকি তারা রাসূলের ওপর এ অপবাদ ও দিতে শুরু করল যে, রাসূল নিজেই এ কুরআন রচনা করেছেন।আল্লাহ তায়ালা তখন বলেন-

اَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىہُ ؕ قُلۡ فَاۡتُوۡا بِعَشۡرِ سُوَرٍ مِّثۡلِہٖ مُفۡتَرَیٰتٍ وَّ ادۡعُوۡا مَنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ۝

"*তারা কি বলে ইহা নিজে রচনা করেছে?বল,তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে অনুরূপ দশটি (সূরা) বাক্য আনয়ন করে এবং আল্লাহ ব্যতিত অপর যাকে পাবে ডেকে নাও।*"(সূরা হূদ-১৩)

আল্লাহ তায়ালা প্রথমে আরবের কাফের নেতৃবৃন্দদের দশটি সূরা রচনা করার কথা বলেছেন।যখন তাতে তারা ব্যর্থ হল তখন তিনি অনুরূপ একটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন-

وَ اِنۡ کُنۡتُمۡ فِیۡ رَیۡبٍ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلٰی عَبۡدِنَا فَاۡتُوۡا بِسُوۡرَۃٍ مِّنۡ مِّثۡلِہٖ ۪ وَ ادۡعُوۡا شُہَدَآءَکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ۝

"*আমি আমার বান্দার ওপর যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমারা তার অনুরূপ সূরা রচনা কর।তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডাকো।তোমরা যদি সত্যবাদী হও।*" (সূরা আল-বারাকা ২৩)

এছাড়া অন্যত্র মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

قُلۡ لَّئِنِ اجۡتَمَعَتِ الۡاِنۡسُ وَ الۡجِنُّ عَلٰۤی اَنۡ یَّاۡتُوۡا بِمِثۡلِ ہٰذَا الۡقُرۡاٰنِ لَا یَاۡتُوۡنَ بِمِثۡلِہٖ وَ لَوۡ کَانَ بَعۡضُہُمۡ لِبَعۡضٍ ظَہِیۡرًا ۝

"*বলুন যদি এ কুরআনের মতো কুরআন রচনার জন্য সমগ্র মানব ও জীন জাতি সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এ কুরআনের মতো কুরআন উপস্থাপন করতে পারবে না।*"(সূরা বণী ইসরাঈল-৮৮)

আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের অনেক আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম বিরোধীদের প্রতি বার বার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন।যাতে তারা একটি সূরা রচনা করে দেখায়। এমনকি সে যুগের কবি সাহিত্যিকদের এ ছোট আয়াতের- اِنَّاۤ اَعۡطَيۡنٰكَ الۡكَوۡثَرَ ؕ

পরবর্তী পংক্তি লিখতে বলা হলে তারা সর্বান্তক প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা অনুরূপ একটি আয়াত ও রচনা করতে সক্ষম হয়নি। সকলের এক বাক্যে চির সত্য কথাই বলতে বাধ্য হয়েছে - যে, এটা কোন মানুষের বানী নয়। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সে যুগেই শুধু নয় বর্তমান বিজ্ঞানের চরম, উৎকর্মের যুগেও কেহ সফল হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত তা কেউ করতেও সক্ষম হবে না। কুরআন যদি আল্লাহর বানী না হয়ে মানুষের রচিত হতো তা হলে এরমধ্যে অনেক অসংগতি পাওয়া যেত। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে –

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوۡنَ الۡقُرۡاٰنَ ؕ وَ لَوۡ كَانَ مِنۡ عِنۡدِ غَيۡرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوۡا فِيۡهِ اخۡتِلَافًا كَثِيۡرًا

"*তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকারো রচিত হতো, তবে অবশ্যই তাতে তারা অনেক অসংগতি খুঁজে পেতো।"* (সূরা : আন নিসা-৮২)

৯.কুরআন বিহীন শরীর বিরান বাড়ীর মত:

আল -কুরআন এসেছে বিশ্ব মানবতার জীবনকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করতে। সত্যের সন্ধান দেওয়ার জন্য, অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য। তবে যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করবে না, কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করবে না, কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে না অর্থাৎ যে দেহের মধ্যে আল - কুরআনের আলো নেয় সেটা উজাড় বাড়ীর মত, ছাড়া বাড়ীর মত। একটা ছাড়া বাড়ীতে যেমন সাপ, বিচ্ছু, তেলাপোকা ইত্যাদি পোকা-মাকড় বসবাস করে। ঠিক তেমনি যে দেহের মধ্যে কুরআন নেই সেই দেহে শয়তান বাস করে। আল-হাদীসে এর সমর্থনে বর্নিত হয়েছে,"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যেই দেহের মধ্যে আল -কুরআনের কোন শিক্ষা নেই সেই দেহটা হচ্ছে উজাড় বাড়ীর মত।" (সূনান আত-তিরমিযি)

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

কুরআন হচ্ছে জ্ঞান -বিজ্ঞানের মূল উৎস। প্রতিদিন গভীর অভিনিবেশ সহকারে কুরআন অধ্যায়নের মাধ্যমে এর অন্তনিহিত বিষয়গুলো উপলব্ধি করে আল্লাহর হুকুমের সত্যতা মেনে নিয়ে আনুগত্যের শির নত করে দেয়াই একজন মুমিনের জীবনের লক্ষ। এ কাঙ্খিত লক্ষ অর্জনের জন্য কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু সকল জ্ঞানের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে কুরআন। তাই নিয়মিত এ কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বহুমুখী জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা যায়। জীবনকে সুন্দর ও সৌন্দর্যময় করে তুলতে এবং ইহকালীন কল্যান ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করতে কুরআনের শিক্ষা জীবনের সবক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। কুরআন তিলাওয়াতের প্রভাব এতই গভীর যে, এর দ্বারা সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের হৃদয় মন জাগ্রত হয় এবং অন্তরে আল্লাহর প্রেম উদয় হয়। তাই মানবজীবনে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব অনেক নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো:

(১) কুরআন শিক্ষা ফরয: প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন পড়া জানতে হবে। যে নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবী করবে তাকে অবশ্যই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। কুরআন শিক্ষা করা এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআন শিক্ষা করা ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

“*পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।*”(সূরা আলাক-১)

কুরআন শিক্ষায় কোন প্রকার অবহেলা করা যাবে না। কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- তোমরা কুরআন শিক্ষা করো এবং তিলাওয়াত করো। (মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ-৮৫৭২)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ।” (সূনান ইবনে মাজা)

ঢ়

জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আল -কুরআন শিক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপরে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা কুরআন ও ফারায়েজ (উত্তারাধিকার আইন) শিক্ষা করো এবং মানুষদেরকে শিক্ষা দাও কেননা আমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে।" (সূনান আত-তিরমিযি)

তাই আমাদের উপরে কর্তব্য আল -কুরআন ও ইলমে ফারায়েজ (উত্তারাধিকার আইন) শিক্ষা করা এবং এর আলোকে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র পরিচালনা করা।

(২) সালাত আদায়ের জন্য কুরআন শিক্ষা : আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার বান্দাদের উপর প্রতিদিন পাচঁ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া নামায আদায় করা যায় না। সালাত আদায় করার জন্যও কুরআন শিখতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে- فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
"*অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুক সহজ ততটুক পড়ো।*" (সূরা : আল - মুযযামিল-২০)
এ বিষয়ে রাসূল (সা.) বলেন -
যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না, তার সালাতেই হবে না।(সহীহ বুখারী-৭৫৬)

(৩) কুরআন প্রচারের জন্য শিক্ষা করা:
কুরআন মাজিদে কুরআন প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে নির্দেশের আলোকে রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম কুরআন প্রচার - প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। যে ব্যক্তি কুরআন পড়তে জানে না, সে তা কীভাবে প্রচার করবে? সুতরাং কুরআন প্রচার - প্রসারে ভূমিকা পালন করার জন্য তা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। কুরআনে বলা হয়েছে- يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

"*হে রাসূল তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌছে দাও।*" (সূরা মায়িদাহ-৬৭)

(৪) কুরআন শিক্ষা অন্তরের প্রশান্তি : মানব জীবনে অর্থ বা অন্যান্য কারনে জাগতিক তৃপ্তি আসলে ও প্রকৃত তৃপ্তি ও শান্তি কুরআন শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে - الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّـهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"*যারা ইমান আনে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিলির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রেখো, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।*" (সূরা আর-রদ-১৮)

(৫).হেদায়েত লাভের জন্য কুরআন শিক্ষা:কুরআনের মাধ্যমেই হেদায়াতের সন্ধান পাওয়া যায়।সেজন্য কুরআন থেকে হেদায়াত পাবার জন্য কুরআন শিক্ষা করতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

"*নিশ্চয়ই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে।যা স সর্বাধিক সরল ও সঠিক।*"
(সূরা বনি ইসরাইল-০৯)

(৬).জান্নাতে যাওয়ার জন্য কুরআন শিক্ষা:প্রত্যেক মুমিনের সর্বোচ্চ কামনা হলো জান্নাতে যাওয়া।তাই জান্নাতে যেতে হলে কুরআন শিক্ষা করতে হবে।হাদিসে এসেছে-সিয়াম ও কুরআন কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য এভাবে সুপারিশ করবে যে,সিয়াম বলবে যে,হে আমার রব,আমি দিনের বেলায় তাকে পানাহার ও যৌনতা থেকে বিরত রেখেছি।তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর।অনুরূপভাবে,কুরআন বলবে হে আমার রব,আমাকে অধ্যয়নরত থাকায় রাতের ঘুম থেকে আমি তাকে বিরত রেখেছি।তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো।রাসূল (সা:) বলেন,অত:পর উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। (মুসনাদে আহনাদ-৬৬২৬)

(৭).কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহর সাথে একটি লাভজনক ব্যবসা:কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহর সাথে একটি লাভজনক ব্যবসা।বিভিন্ন ব্যবসায় লাভ এবং ক্ষতি দুটোরই সম্ভাবনা থাকে।কিন্তু এখানে লাভ ছাড়া কোনো প্রকার ক্ষতির অংশ নেই।এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور

*"যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে,সালাত কায়েম করে,আমার দেয়া রিজিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে।তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসায় যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দান করবেন।তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"*সূরা ফাতির-(২৯-৩০)

(৮).কুরআন পাঠকারী প্রত্যেক হরফের জন্য সওয়াব লাভ করবে:কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বিরাট সওয়াব অর্জন করার সুযোগ রয়েছে।এর সাথে অনেক উপকারিতা রয়েছে।রাসূল (সা:) বলেছেন-যে ব্যাক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে।তাকে একটি নেকি প্রদান করা হয়।প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান।আমি বলি না যে- আলিফ লাম মীম।একটি হরফ।বরং আলিফ একটি হরফ,লাম একটি হরফ,মীম একটি হরফ।(সুনানে আত-তিরমিজি ২৯১০)

(৯).কুরআনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সর্বত্তোম ব্যাক্তি:কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায়।উসমান (রা:)থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা:) বলেছেন-তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাক্তি সেই ব্যাক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।(বুখারী- ৫০২৭)

(১০).কুরআন তিলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে:যে ব্যাক্তি কুরআনের শিক্ষা লাভ করবে নিয়মিত কুরআন পাঠ করবে ও কুরআন অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করবে সে ব্যাক্তি কিয়ামতের দিন তার পরিবারের সদস্যদের জন্য সুপারিশ করার

অধিকারী লাভ করবে।রাসূল (সা:)বলেছেন-তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর,কারণ কিয়ামতের দিন তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ। (মুসলিম)

(১১).কুরআন তিলাওয়াতকারীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য : আবু মুসা আল আশ'আরি (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে তার উদাহরণ হলো লেবুর মতো তার স্বাদও ভালো আবার ঘ্রাণও ভালো। মুমিনের উদাহরণ কোনো ঘ্রাণ নেই, আর কুরআন তিলাওয়াতকারী পাপী ব্যক্তির উদাহরণ হলো ফুলের মতো ঘ্রাণ ভালো কিন্তু স্বাদ তিক্ত, আর যে কুরআন তিলাওয়াত করে না এমন হাফেজের উদাহরণ হলো মাকাল ফলের মতো যার স্বাদ তিক্ত এবং সুগন্ধ নেই।' (সহিহুল বুখারি, হাদিস : ৭৫৬০)

(১২).কুরআন তিলাওয়াতে দরিদ্রতা দূর হয় : বহু মানুষের পরীক্ষিত আমল সূরা ইখলাস। এ সূরা সবারই মুখস্থ আছে। বেশি বেশি পড়লে রাব্বুল আলামিন অভাব মোচন করে দেবেন। সাহল ইবনে সায়েদি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে দারিদ্র্যের অভিযোগ করল, রাসূল (সা.) তাকে বলেন, যখন তুমি ঘরে যাও তখন সালাম দেবে এবং একবার সূরা ইখলাস পড়বে। সাহাবি লাগাতার ক'দিন আমল করেন। ফলে কিছু দিনের মধ্যে তার দারিদ্র্য দূরীভূত হয়ে যায়। (কুরতুবি : ২০/১৮৫)

(১৩).আল -কুরআন শিক্ষা করা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত:

আল -কুরআন অধ্যয়ন করা, কুরআন জানা-বুঝার চেষ্টা করা পৃথিবীর সকল কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজ। কারণ এ কুরআনের মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি, হিদায়াতের সঠিক পথ। প্রত্যেক কাজ শুরু করার সময় রাসূল (সা.) বিসমিল্লাহ পড়ে (আল্লাহর নাম নিয়ে) শুরু করার কথা বলেছেন। কিন্তু কোন কাজ শুরু করার আগে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রাজীম' অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেননি। তবে একটি কাজ করার আগে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে আল্লাহর

কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, সেটা হলো আল -কুরআন তিলাওয়াত বা অধ্যয়নের সময়। এ সম্পর্কে আল -কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
"*সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও।"* (সূরা আন-নাহল-৯৮)

আল -কুরআনের এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, শয়তান সকল কাজে কুমন্ত্রনা দেয়, তবে কুরআন অধ্যয়নের সময় সবচেয়ে বেশী কুমন্ত্রনা দেয়। কারণ কুরআন যাতে মানুষ বুঝতে না পারে, সেজন্য শয়তান বেশী চেষ্টা করে। মুসলমানরা কুরআন থেকে দূরে সরে থাকলে শয়তান বেশী খুশি হয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআন অধ্যয়নের সময় শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলেছেন। এজন্য আমাদের উচিৎ আল -কুরআন জানা ও বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করা।

(১৪).আল -কুরআন হিদায়াতের একমাত্র কিতাব:

আল -কুরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবাতার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব। এই কুরআনই বিশ্বের সকল মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে, হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (٩) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"*নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।*' (সূরা বনি ইসরাইল- ৯-১০)

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (১৫) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।" (সূরা আল-মায়েদা- ১৫-১৬)

আল -কুরআন ছাড়া অন্য কারো কাছে হিদায়াত অন্বেষণ করা যাবে না। কেউ এটা করলে আল্লাহ নিজে তাকে গুমরাহ করে দিবেন। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কুরআন ছাড়া অন্য করো কাছে হিদায়াত চাইবে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দিবেন।" (সূনান আত-তিরমিযি)

অতএব, আমাদের জীবন চলার পাথ ইসলামকে সঠিকভাবে জানার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব আল -কুরআন শিক্ষা করতে হবে।

(১৫).আল -কুরআনের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে:

বিশ্ব মানবতার জীবন পরিচালনার জন্য যা দরকার আল্লাহ তাআলা আল -কুরআনের মধ্যে সব দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্য এমন কিছু নাই যার প্রয়োজন আছে অথচ কুরআনে তা বলা হয়নি, বরং সব কিছুকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিস্কার করে আল -কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

"*আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।"* (সূরা আন-নাহল- ৮৯)

এ কিতাব থেকে যদি কেউ তার জীবনের চলার গাইড হেসেবে সম্পূর্ণটা মেনে চলে তাহেল সে সকল ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করবে। আর যদি কিছু মানে কিছু অস্বিকার করে তাহলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ِ

"*তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।*" (সূরা আল-বাকারা- ৮৫)

(১৬).কুরআন তেলাওয়াত ঈমান বৃদ্ধি করে : কুরআন তেলাওয়াত বান্দার জন্য এমন উপকারী যে, তা তেলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۙ َ

মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে' (সূরাআনফাল -২)।

কুরআনে আরো এসেছে, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ِ

"*যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তারাই এর প্রতি ঈমান এনেছে'* (বাকারা ১২১)।

(১৭).কুরআন শিক্ষা অন্তরের প্রশান্তি : মানব জীবনে অর্থ বা অন্যান্য কারণে জাগতিক তৃপ্তি আসলেও প্রকৃত তৃপ্তি ও শান্তি লাভ কুরআন শিক্ষার মাধ্যমেই

সম্ভব। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب

'যারা ঈমান আনে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায় (রা'দ ২৮)।

(১৮).কুরআনের ধারক-বাহক ঈর্ষণীয় ব্যক্তি : কোন ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তার হক আদায় করে তেলাওয়াত করলে তার সাথে ঈর্ষা করা যাবে অর্থাৎ তার মত হওয়ার আকাঙ্খা করা যাবে, যাকে গিবতাহ বলা হয়। রাসূল (সা:) বলেন, لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَار 'একমাত্র দুই ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা যায়। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের ইলম দান করেছেন, সে দিবা-রাত্রি ঐ কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকে।(মুত্তাফাক আলাইহ হা/২০২)

(২৯).কুরআন অধ্যয়নকারীকে আল্লাহ স্বরণ করেন :এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে আল-কুরআন অধ্যয়ন করা এবং সে অনুযায়ী জীবনে আমল করা। যারা দুনিয়ায় আল-কুরআন অধ্যয়ন করবে, জেনে-বুঝে আমল করবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাদেরকে স্বরণ করবেন এবং এই কুরআনের সংস্পর্শে থাকার কারণে তাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে দিবেন।

এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'হযরত আবু যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি একটি লম্বা হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আামকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা ইহা তোমার সমস্ত আমলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে। (আবু যার গিফারী বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আপনি আমাকে আরো অতিরিক্ত কিছু উপদেশ দিন। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি কুরআন তিলাওয়াত

করবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্বরণ করবে, তাহলে আসমানে তোমাকে স্বরণ করা হবে এবং দুনিয়ায় এটা তোমার জন্য আলোকবর্তিকা হবে।' (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান)

(২০).কুরআন তিলাওয়াতকারীরা ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবেন: আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'কুরআন তেলাওয়াত পারদর্শী ব্যক্তিরা সম্মানিত ফেরেশতাগণের সঙ্গে থাকবে। আর যারা আটকিয়ে কষ্ট করে কুরআন তেলাওয়াত করে তারা দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।' (মুসলিম: ১৮৯৮)

হাদিসে কুরআন তেলাওয়াতকারীদের আল্লাহর পরিজন বলা হয়েছে। ইরশাদ করা হয়েছে, 'কতক লোক আল্লাহর পরিজন। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তারা কারা? তিনি বলেন, কুরআন তেলাওয়াতকারীগণ আল্লাহর পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।' (ইবনে মাজাহ: ২১৫)

হাশরে কুরআন তেলাওয়াতকারীদের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হবে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নবী (স.) বলেছেন, কুরআন কেয়ামত দিবসে হাজির হয়ে বলবে, হে আমার প্রভু! একে (কুরআনের বাহককে) অলংকার পরিয়ে দিন। তারপর তাকে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রভু! তাকে আরো পোশাক দিন। সুতরাং তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রভু! তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কাজেই তিনি তার ওপর সন্তুষ্ট হবেন। তারপর তাকে বলা হবে, তুমি এক এক আয়াত পাঠ করতে থাকো এবং ওপরের দিকে উঠতে থাকো। এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়াব (মর্যাদা) বাড়ানো হবে।' (তিরমিজি: ২৯১৫)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নবী (স.) বলেছেন, (কেয়ামতের দিন) কুরআনের বাহককে বলা হবে, পাঠ করতে থাকো এবং উপরে আরোহণ করতে থাকো এবং দুনিয়ায় যেভাবে ধীরেসুস্থে পাঠ

করতে, ঠিক সেইরূপে ধীরেসুস্থে পাঠ করতে থাকো। যে আয়াতে তোমার পাঠ সমাপ্ত হবে সেখানেই তোমার স্থান।' (তিরমিজি: ২৯১৪)

(২১).আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান :

কুরআন মাজীদের প্রকৃত বাহকের মর্যাদা সর্বাধিক। তাই হাফেযে কুরআন ও আলেমের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা আবশ্যক। যেমন আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেন,বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলিম ও কুরআনের যথাযথ বাহক, যিনি তাতে সীমালঙ্ঘনকারী ও অবহেলাকারী নন, এমন ব্যক্তিকে সম্মান করা মূলতঃ আল্লাহরই প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত'। (আবুদাঊদ হা/৪৮৪৩; মিশকাত হা/৪৯৭২; ছহীহুল জামে' হা/২১৯৯।)

(২২).ঈমানী জ্যোতির বিকিরণ :

জুম'আর দিন সূরা কাহফ তেলাওয়াত করলে এক জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত তার ঈমান শাণিত থাকে এবং এ সময়ের যাবতীয় ফিৎনা থেকে আল্লাহ তাকে হেফাযত করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেন,مَن قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ- 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহফ তেলাওয়াত করে, তার ঈমানী জ্যোতির বিকিরণ থাকবে এক জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত'।

বায়হাক্বী, আদ-দা'আওয়াতুল কাবীর হা/৫২৬; হাকেম হা/৩৩৯২; মিশকাত হা/২১৭৫; ছহীহুত তারগীব হা/৭৩৬

(২৩).তেলাওয়াতকারীর পাপ সমূহ নেকীতে পরিবর্তিত হয় : পৃথিবীর বুকে এমন কোন গ্রন্থ নেই, যা পাঠ করলে পাপসমূহ ক্ষমা করা হয় এবং তাদের কৃত পাপসমূহ নেকীতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করলে আল্লাহ তাকে যাবতীয় গোনাহ থেকে মুক্ত করবেন। কেননা আল্লাহকে স্মরণের অন্যতম মাধ্যম হ'ল কুরআন নিয়ে আলোচনা করা। যেমন রাসূল (সা:) বলেন যখন কোন জনসমষ্টি আল্লাহকে স্মরণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় অতঃপর পৃথক

হয়, তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পাপ থেকে ক্ষমাকৃত অবস্থায় দন্ডায়মান হও। কেননা তোমাদের পাপকে পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে'। আহমাদ হা/১২৪৭৬; মুসনাদ আবু ইয়া'লা হা/৪১৪১; ছহীহুত তারগীব হা/১৫০৪।

(২৪).গাফেলদের তালিকা থেকে মুক্তি :নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতে ঈমান মযবূত হয়। অন্তরের মরীচা বিদূরিত হয়। এমনকি উদাসীনতার কুহক থেকে মুক্ত হয়ে সোচ্চার ও শক্তিশালী মুমিনে রূপান্তরিত হওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেন,... وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ-

“আর যে ব্যক্তি রাতে একশ'টি আয়াত তেলাওয়াত করবে, গাফেলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না অথবা তার নাম বিনয়ীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে”' ।ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১১৪২; বায়হাক্বী শো'আব হা/২০০২; মিশকাত হা/২১৮৬; ছহীহুত তারগীব হা/৬৪০

(২৫).আসমান ও যমীনে উচ্চসম্মান অর্জন :কুরআন নিঃসন্দেহে ইহকাল ও পরকালের উচ্চসম্মান অর্জনের সোপান। ফলে কুরআন তেলাওয়াতকারীর সুনাম আসমানে ও যমীনে ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল (সা:) বলেন, কুরআন তেলাওয়াতকে তুমি আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি তোমার জন্য যমীনে আলোকবর্তিকা ও আসমানে ধনভান্ডার স্বরূপ'।ছহীহ ইবনু হিববান হা/৩৬১; মিশকাত হা/৪৮৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৪২২, ২২৩৩।

অতএব যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদয়কে কুরআনের দিকে ও আল্লাহর দিকে পরিচালিত করবে, মহান আল্লাহ তাকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সেকারণ তেলাওয়াতকারীর কর্তৃত্ব ও প্রভাব তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবদিকে বিস্তৃত হয়। সুতরাং কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এবং তাঁর সৃষ্টির কাছে মহা সম্মানিত হয়।

(২৬).কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিন মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতম : রাসূলুল্লাহ (সা:) বিভিন্ন সময় ছাহাবায়ে কেরামকে নানা উদাহরণের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। যেমনটি তিনি অন্যান্য মুমিনের চাইতে কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার সময় শিক্ষা দিয়েছিলেন। আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (সা.) কুরআন তেলাওয়াত করে, সে হ’ল উৎরুজ্জা ফলের (কমলালেবুর) ন্যায়। ফলটি সুগন্ধিযুক্ত এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে না, তার উদাহরণ হ’ল খেজুরের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই কিন্তু সুস্বাদু। আর যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে, সে হ’ল রায়হানা (লতানো) ফুলের ন্যায়। যা সুগন্ধিযুক্ত, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে না, সে হ’ল মাকাল (লতানো লেবুজাতীয় তিক্ত) ফলের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত’।বুখারী হা/৫৪২৭; মুসলিম হা/৭৯৭; মিশকাত হা/২১১৪।

(২৭).কুরআন তেলাওয়াতকারীকে (হাফেজে কুরআনকে) কুরআনের আয়াতের সংখ্যার সমপরিমাণ তলা বিশিষ্ট প্রাসাদ দেওয়া হবে

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন কিয়ামতের দিন কুরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি তা পাঠ করতে থাক এবং উপরে চড়তে (উঠতে) থাক। তুমি তাকে ধীরেসুস্থে পাঠ করতে থাক, যেভাবে তুমি দুনিয়াতে পাঠ করতে। কেননা তোমার সর্বশেষ বসবাসের স্থান (জান্নাত) সেখানেই হবে, যেখানে তোমার কোরআনের আয়াত শেষ হবে। (আবু দাউদ, হাদীস : ১৪৬৪)

(২৮).কুরআন তেলাওয়াতকারীকে (হাফেজে কুরআনকে) সম্মান:আশআরী রা.থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, (৩ব্যক্তি) ক. বয়স্ক মুসলমান, খ. কুরআনের হাফেজ যে এর অর্থের মধ্যে কোন রকম কমবেশী করে

না এবং গ. ন্যায়-পরায়ণ বাদশার সম্মান করা, মহান আল্লাহকে সম্মান করার ন্যায়। (আবু দাউদ, হাদীস : ৪৮৪৩)

(২৯).কুরআন রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ চিকিৎসা:হযরত ইবনে মাসউদ (রা:)হতে বর্ণিত।তিনি বলেন,রাসূল (সা:) বলেছেন:এ কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ভোজনের আয়োজন।সুতরাং,তোমরা যতটা পার,তার ভোজনের আয়োজনকে গ্রহণ করো।এ কুরআন হচ্ছে আল্লাহর রজ্জু,সমরজ্জু জ্যোতি,রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ চিকিৎসা এবং যে একে ধারণ করে,তার জন্য রক্ষক,যে এর অনুসরণ করে তার জন্য ত্রানকর্তা।এ কুরআন কখনো ভুল বলে না যে তাকে শুধরাতে হবে।কখনো একে বেঁকে চলে না যে তাকে সোজা করে দিতে হবে।এ বিস্ময়ের কোন শেষ নেই এবং বহুবার পুনরাবৃত্তি করা সত্ত্বেও তা পুরনো হয় না। তোমরা কুরআন পাঠ কর,কেননা আল্লাহ তোমাদেরকে কুরআন পাঠের জন্য প্রতি অক্ষরে দশটা সওয়াব দান করে থাকেন।ভালো করে বুঝে নাও,আমি বলছি না আলিফ লাম মীম একটা অক্ষর বরং আলিফ একটা অক্ষর লাম একটা অক্ষর মীম একটা অক্ষর।

(হাকেম)

মানুষের অন্তর কুফরি ও গুনাহ করার ফলে কলুষিত ও সত্যবিমুখ হয়।ইহা অন্তরের ব্যাধি। কুরআনের উপদেশ গ্রহণ করলে সেই অন্তর ব্যাধি মুক্ত হয়।সুস্থ অন্তরের জন্য কুরআন হলো হেদায়েত ও রহমত।এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী- يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۷﴾

"*হে মানুষ!তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।*"(সূরা ইউনুস :৫৭)

(৩০).কুরআনের বিধান উন্নয়নের চাবিকাঠি:কোন জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হলে তা কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব।কেননা কুরআনের বিধান

জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ
"*আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন করে না যতক্ষন উহারা নিজে অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।*"(সূরা আর রা'দ :১১)

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا
"*আমি অবতীর্ণ করি কুরআন,যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত,কিন্তু উহা যালিমদের জন্য ক্ষতি বৃদ্ধি করে।*"(সূরা বনী ইসরাইল : ৮২)

হযরত উমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,নবী করীম(স:) বলেছেন আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই এ কুরআনের দ্বারা জাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং এ কুরআনের বিধান অমান্য করার কারণে অনেক জাতির পতন ঘটেছে।(মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূল (সা:)বলেছেন-প্রত্যেক বস্তুর একটি গৌরবের বিষয় আছে যার দারা তা গৌরবান্বিত হয়।কিন্তু আমার উম্মতের সৌন্দর্য ও গৌরবের বিষয় হলো পবিত্র কুরআন।(পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন:৭৫)

(৩১).কুরআন তেলাওয়াত মুসলিমদের উত্তরাধিকার:আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা মদিনার বাজার অতিক্রম করার সময় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদের সম্বোধন করে বললেন, হে বাজারের লোকেরা কোন জিনিস তোমাদেরকে আটকিয়ে রেখেছে? লোকেরা বলল, হে আবূ হুরায়রা এটা কেমন কথা? আবূ হুরায়রা বলল, ওখানে নবী (সা.) এর মিরাস (সম্পত্তি) বন্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে বসে আছ? তোমরা কেন ওখানে যাচ্ছ না? আর নিজেদের অংশ গ্রহণ করছ না? লোকেরা জিজ্ঞেস করল সম্পত্তি কোথায় বন্টন হচ্ছে? আবূ হুরায়রা (রা) বলল, মসজিদে। লোকেরা দ্রত মসজিদে গেল, আবূ হুরায়রা (রা.) ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন, লোকেরা মসজিদ থেকে ফিরে আসল, আবূ হুরায়রা (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করল কী হলো তোমরা ফিরে আসলে কেন? লোকেরা বলল, আমরা মসজিদে গেলাম কিন্ত ওখানে কোনোকিছু বন্টন হতে দেখলাম না,

তাই আমরা ফিরে আসলাম। আবূ হুরায়রা (রা.) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি মসজিদে কাউকে দেখো নি? লোকেরা বলল, কেন নয় আমরা ওখানে কিছু লোককে নামাজ আদায় করতে দেখেছি, আবার কিছু লোক কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছে, আবার কিছু লোক হালাল হারামের মাসয়ালা-মাসায়েল বর্ণনা করছে। আবূ হুরায়রা (রা.) বলল, তোমাদের অবস্থা দেখে আমার আফসোস হচ্ছে, এটাইতো রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মিরাস (সম্পত্তি)। (মুজামুল আওসাত, হাদিস: ১৪৩০)

(৩২).মুনকার-নাকিরের প্রশ্নের উত্তরে সফল হওয়ার কারণ:বারা ইবনু‘আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কবরে মুমিন ব্যক্তির নিকট দু‘জন ফেরেশতা আসবে, তারা এসে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তোমার রব কে? (মুমিন হলে) সে বলবে আমার রব আল্লাহ, তারা আবার জিজ্ঞেস করবে তোমার দ্বীন কী? সে বলবে আমার দ্বীন ইসলাম, তারা আবার জিজ্ঞেস করবে তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিল তার ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? সে উত্তরে বলবে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল (সা.)। তারা আবার বলবে তুমি এগুলো জানলে কীভাবে? তখন ওই ব্যক্তি বলবে আমি মহান আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করেছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করেছি।’(সুনান আবূ দাউদ, হাদিস ৪৭৫৫)

(৩৩).পুরো রাত ইবাদত করার সমান সওয়াব পাবে:তামিম আদ্দারি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে এক’শ আয়াত তেলাওয়াত করবে সে সম্পূর্ণ রাত জাগরণকারী হিসেবে গণ্য হবে।’ (সুনান আদ্ দারেমি, হাদিস: ১৬৯৫৮)

(৩৪).দশটি আয়াত পৃথিবী ও সবকিছু থেকে উত্তম :ফুযালা ইবনু উবাইদ এবং তামিমুদ্দারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামাজে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে তার

জন্য এক কিন্তার সওয়াব, আর এক কিন্তার সওয়াব হলো পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম, কিয়ামতের দিন তোমর রব বলবে, কোরআনের প্রতিটি আয়াতের বদলে এক স্তর উপরে উঠো, এভাবে সর্বশেষ আয়াত তেলাওয়াত করা পর্যন্ত উপরে উঠতে থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে বলবেন, আমার নিয়ামত গ্রহন করার জন্য তোমার হাত উন্মোক্ত করো, বান্দা হাত উন্মোক্ত করে বলবে, হে আমার রব! তুমি তোমার দান সম্পর্কে ভালভাবে জানো, আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'এক হাতে স্থায়ী নিয়ামতসমূহ গ্রহণ করো আর অপর হাতে অন্যান্য নিয়ামতসমূহ গ্রহণ করো।' (মুজামুল কাবীর, হাদিস: ১২৫৩)

(৩৫).আল্লাহ-রাসুলের সঙ্গে ভালোবাসা সৃষ্টি করে:আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের সঙ্গে ভালোবাসার স্থান করতে চায় সে যেন কুরআন তেলাওয়াত করে।' (হুলাইয়াতুল আউলিয়া, হাদিস : ১৮৭২)

(৩৬).আল্লাহ তায়ালা তিলাওয়াতকারীদের ৪ টি নিয়ামত দান করবেন:

- তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল হবে
- আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি দয়া করবেন।
- ফেরেশতাগণ তাদের চতুষ্পার্শ্বে তাদের সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়।
- আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণের নিকট তাদের গৌরবের সঙ্গে স্বরণ করেন।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কিছু লোক মহান আল্লাহর ঘরে উপস্থিত হয়ে কুরআন তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষা দেয় এবং শিক্ষা নেয়, তখন তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়, মহান আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবরিত করে রাখে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে আর আল্লাহ তায়ালা তাদের কথা ওদের নিকট স্বরণ করে যারা তার নিকট আছে, স্বরণ রাখো যার আমল তাকে পেছনে রেখেছে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৭০২৮)

(৩৭).তেলাওয়াতে সিজদার বিনিময় :

পবিত্র কুরআনে **১৫**টি সিজদার আয়াত আছে। যেগুলো পাঠ করলে সিজদা করতে হয়। এ সিজদার অনেক ফযীলত রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيْلَهُ، وَفِى رِوَايَةٍ : يَا وَيْلِى أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ- 'আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদায় করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায়, দুর্ভাগ্য! অন্য বর্ণনায় রয়েছে হায়, আমার দুর্ভাগ্য! আদম সন্তান সিজদার জন্য আদিষ্ট হ'ল। অতঃপর সে সিজদা করল এবং এর বিনিময়ে সে জান্নাত পেল। আর আমাকে সিজদার আদেশ করা হ'ল, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হ'ল' ।মুসলিম হা/৮১; মিশকাত হা/৮৯৫।

(৩৮).কুরআন তেলাওয়াতকারীর দুনিয়াবী মর্যাদা :কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তির মর্যাদা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে বৃদ্ধি পায়। নাফে' বিন আব্দুল হারিছ (রাঃ) উসফান নামক স্থানে ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন। ওমর (রাঃ) তাকে কর্মকর্তা হিসাবে মক্কায় নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তিনি নাফে'কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মক্কা ও ত্বায়েফের উপত্যকাবাসীদের জন্য কাকে তোমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছ? তিনি বললেন, ইবনু আবযাকে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ইবনু আবযা? তিনি বললেন, আমাদের আযাদকৃত গোলামদের একজন। ওমর (রাঃ) বললেন, فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ 'তুমি একজন ক্রীতদাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত করেছ?' নাফে' বললেন, إِنَّهُ قَارِئٌ لِّكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قَاضٍ، 'তিনি মহান আল্লাহর কিতাবের একজন বিজ্ঞ আলেম, ফারায়েয শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ বিচারক'। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের নবী (সা:) যথার্থই বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ- 'এই কিতাবের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ অনেক

জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং কুরআন পরিত্যাগকারীদের অবনত করেন’।মুসলিম হা/৮১৭; ইবনু মাজাহ হা/২১৮; মিশকাত হা/২১১৫।

(৩৯).কুরআন পড়া ও শোনার অশেষ সওয়াব:হযরত আবু হুরায়রা(রা:)হতে বর্ণিত,তিনি বলেন:রাসূল(সা:)বলেছে-যে ব্যাক্তি কুরআনের একটি আয়াত মনোযোগ সহকারে শুনবে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লিখা হবে।আর যে ব্যাক্তি স্বয়ং তিলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য(কুরআন)নূর হবে।(আহমদ)

(৪০)ফেরেশতাগণ তিলাওয়াত শোনেন:হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:)হতে বর্ণিত।একদিন ঊসাইদ বিন হুযাইর (রা:)একদিন রাতের বেলা কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন।হঠাৎ তারঁ ঘোড়া ছুটাছুটি করলো।তারপর তিনি একটু বিরতি দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন।ঘোড়াটি কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবারও ছুটাছুটি শুরু করল।ঊসাইদ বিন হুযাইর বলেন:আমি আশাংকা করছিলাম ঘোড়াটি (আমার ছেলে) ইয়াহিয়াকে পদপিষ্ট করে ফেলে কি না।আমি তার কাছে গেলাম।দেখলাম আমার মাথার ওপরে মেঘের মতো কি যেন রয়েছে এবং তার ভেতর প্রদীপের মতো কিছু বস্তু রয়েছে।মেঘটা যেন শূণ্যে উঠে গেল।আমি আর তা দেখতে পেলাম না।সকাল বেলা আমি রাসূল (সা:)এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং বললাম হবে রাসূল (সা:)! গত মধ্য রাতে আমি যখন কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম তখন আমার ঘোড়াটি ছুটাছুটি করতে লাগলো।তিনি বললেন: তা করুক।ওহে ইবনে হুযাইর,তুমি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকবে।উসাইদ বিন হুযাইর বললো:এরপর আমি আবারও তিলাওয়াত করেছি।আবারও আমার ঘোড়া ছুটাছুটি করছে।রাসূল (সা:)বললেন তবুও তুমি তিলাওয়াত করতে থাকো।উসাইদ বিন হুযাইর বলেন:এরপর আমি ঘোড়ার কাছে ছুটে গেলাম।ঘোড়াটি আমার ছেলে ইয়াহিয়াকে পদপিষ্ট করে ফেলতে পারে বলে আশংকা হয়েছিল।আমি দেখলাম,মেঘের মতো একটা কি যেন এবং তার ভেতর অনকগুলো বাতির মত কি যেন রয়েছে।মুহুর্তের মধ্যে তা শুণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।আমি আর তা দেখলাম না।রাসূল (সা:)বলেন:তা ছিল একদল ফেরেশতা।তারা তোমার তিলাওয়াত

শুনছিল।তুমি যদি সকাল পর্যন্ত পড়তে থাকতে,তবে সকাল বেলা তাদেরকে লোকেরা দেখতে পেত।তারা মানুষের চোখের আড়ালে হতো না।(বুখারী ও মুসলিম)

(৪১).কুরআনের আয়াত ঘরের বাতিস্বরূপ:হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন,কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত বেহেশতের একেকটি দরজা এবং তোমাদের ঘরের একেকটি বাতিস্বরূপ।তিনি আরও বলেছেন:যে কুরআন পাঠ করে,সে যেন তার দু'পার্শে নবুয়্যতের দরজা উম্মুক্ত করল।তবে তার কাছে ওহী আগমন করবে না।হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন,যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়,সে ঘরের লোকদের রুজিতে বরকত সচ্ছলতা আসে।তাদের ওপর থেকে কল্যাণ দেখা দেয়,সে ঘরে ফেরেশতাদের সমাবেশ ঘটে।আর শয়তান ও তার দলবল সে ঘর থেকে দূর হয়ে যায়।পক্ষান্তরে যে ঘরে আল-কুরআন তিলাওয়াত হয় না,সে ঘরের অধিবাসীদের রুজি সংকীর্ণ হয়ে যায়।তাদের উপর থেকে কল্যাণ ও মঙ্গল-হ্রাস পায়। ফেরেশতাগণ সে ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং শয়তান ও তার দলবল সে ঘরে আস্তানা পড়ে।(এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন:১ম খণ্ড:২৬৮)

(৪২).শয়তানের পলায়ন:হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত।রাসূল (স.) বলেছেন:কোন মানুষ যখন সিজদায় আয়াত পড়ে এবং তৎক্ষনাৎ সিজদাহ্ দেয়,শয়তান কাদঁতে কাদঁতে সেখান থেকে পলায়ন করে। আর বলে: হায়,আমার পোড়া কপাল!আদম সন্তানকে সিজদাহ্ করার আদেশ দেয়া হলো,সে। সিজদাহ্ করলো,এতে সে জান্নাতের অধিকারী হলো।আর আমাকে সিজদাহ্ করার আদেশ দেয়া হলো,আমি অস্বীকার করলাম,এতে আমি জাহান্নামের যোগ্য হলাম।(মুসলিম ইবনে মাযা)

আরববাসীদের উপর কুরআনের আশ্চর্য প্রভাব

কোরায়েশদের শত বাধা সত্ত্বেও দিন দিন যে ইসলামের প্রভাব আশ্চর্যজনকভাবে বেড়ে চলছিল তার মূলে ছিল পবিত্র কুরআনের অলৌকিক প্রভাব। নিম্নের ঘটনা কয়টিই উহার বাস্তবতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

প্রথম দিকে প্রায় তিন বছর কাল হুজুর (সঃ) ইসলামের দাওয়াত গোপনে দিতে থাকেন। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তিনি প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনা করেন, আর এই সময়ই শুরু হয় কোরায়েশদের সাথে সংঘাত। এ সময় কোরায়েশরা একদিকে মুহাম্মদের (সঃ) দরিদ্র ও দুর্বল সাথীদের পরে নানারূপ শারীরিক নির্যাতন শুরু করে এবং অন্যদিকে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) নানারূপ প্রলোভন দ্বারা সত্য পথ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে কোরায়েশ নেতাদের প্রস্তাবক্রমে তাদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ওৎবা বিন রাবিয়াকে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) নিকট একটি আপোষ প্রস্তাব নিয়ে পাঠান হয়। উতবা হুজুরের খেদমতে হাজির হয়ে এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করে যে, "হে মুহাম্মদ (সঃ) তুমি এ নতুন মতবাদ পরিত্যাগ কর , তাহলে তোমাকে আমাদের নেতা করে নেব। যদি তুমি ধনের আকাঙ্খা কর, তাহলে আমরা তোমাকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী করে দেব আর যদি তুমি সুন্দরী মহিলার লোভ রাখ, তাহলেও আমরা তোমার সে বাসনা পূর্ণ করে দেব"। হুজুর বললেন, নেতৃত্ব, ধন আর নারী কেন। তোমরা যদি আমার এক হাতে আকাশের সূর্য ও অন্য হতে চন্দ্রও এনে দাও তবুও আমি এ মতবাদ ত্যাগ করতে পারব না। অতঃপর হুজুর সূরায়ে হা-মিমের কয়েকটি আয়াত তার সামনে তেলওয়াত করলেন।

উতবা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উহা শ্রবণ করল। তার বাকশক্তি বন্ধ হয়ে গেল এবং ভিতর হতে সে তার সমস্ত শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেলল। অতঃপর সে সেখানে ফিরে গেল, যেখানে কোরায়েশ দলপতিরা তার পথ চেয়েছিল এবং মনে মনে একটি শুভ সংবাদের আশা করছিল।

উতবা কোরায়েশ নেতাদেরকে লক্ষ করে বলল, দেখ তোমরা মুহাম্মদকে বাধা দিও না। অতঃপর যখন তাঁর দাওয়াত কোরায়েশদের এলাকার বাইরে চলে যাবে, তখন অ-কোরায়েশদের সাথে মুহাম্মদের (সঃ) সংঘর্ষ হবে। সে সংঘর্ষে যদি মুহাম্মদ (সঃ) পর্যুদস্ত হয়, তাহলেও তোমাদের লাভ। কেননা তোমাদের শত্রু ধ্বংস হল, অথচ তোমাদেরকে সংঘাতে লিপ্ত হতে হল না। আর যদি মুহাম্মদ (সঃ) জয়ী হয়, তাহলেও তোমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। কেননা তোমাদের কোরায়েশ বংশেরই একটি লোক আরবদের নেতা হবে।

এহেন প্রস্তাবে উপস্থিত নেতারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং অনুসন্ধান করে জানতে পারল যে, মুহাম্মদের (সঃ) মুখ নিঃসৃত কুরআনের বানী শুনেই উতবা অভিভূত হয়ে পড়েছে, ফলে মুহাম্মদের সম্পর্কে সে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছে।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটে আবিসিনিয়ায়। তখন নবুয়তের পঞ্চম বর্ষ। কোরায়েশদের উৎপীড়নে জর্জরিত হয়ে হুজুর (সঃ) প্রথমে ষোলজন এবং পরে তিরাশিজন মুসলমান নর-নারীর দুটি দলকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করেন। আবিসিনিয়ার ইসায়ী শাসক নাজ্জাশী ছিলেন অত্যন্ত সুবিচারক এবং প্রজাবৎসল। তিনি মুসলমানদেরকে তার দেশে বসবাসের আদেশ দিলেন। এদিকে কোরায়েশ সর্দারগণ এটা জানতে পেরে একটি যোগ্য প্রতিনিধি দলকে প্রচুর উপঢৌকনসহ নাজ্জাশীর দরবারে পাঠাল। তারা নাজ্জশীর খেদমতে হাজির হয়ে উপঢৌকন পেশ করে বলল, মহারাজ, আমাদের কিছু যুবক-যুবতী কিছু গোলাম আমাদের নেতাদের অবাধ্য হয়ে তাদের অনুমতি (ছাড়পত্র) ছাড়াই আপনার দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদেরকে ফেরত নেয়ার জন্যই আমাদেরকে আপনার খেদমতে পাঠান হয়েছে। দয়া করে আপনি তাদেরকে আমাদেরকে হাতে সমর্পণ করবেন। দরবারীরাও পলাতকদেরকে ফেরত দেয়ার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু বাদশাহ্ বললেন, তাদের বক্তব্য না শুনে আমি তাদেরকে ফেরত দিতে পারিনা। অতঃপর

তাদেরকে ডাকা হল এবং কেন তারা দেশ ত্যাগ করে এসেছে তা বলতে বলা হল।

মুসলিম দলের নেতা হযরত আলীর ভ্রাতা হযরত জাফর দাঁড়িয়ে বললেন, জাহাঁপনা' আমরা ইতিপূর্বে মূর্তিপূজাসহ নানারূপ কুসংস্কারে লিপ্ত ছিলাম। মারামারি, খুন-খারাবী, রাহাজানী ও লুটতরাজ ছিল আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। ইতিমধ্যে আল্লাহ মেহেরবানী করে আমাদের ভিতরে একজন নবী পাঠালেন। তিনি আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করতে, সত্য কথা বলতে, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে, গরীব মিসকিনদের প্রতি সদয় হতে এবং খুন-খারাবী ও লুটতরাজ পরিত্যাগ করে পবিত্র জীবন-যাপন করতে আহ্বান জানালেন। আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার দ্বীন গ্রহণ করি। ফলে আমাদের গোত্র নেতারা আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে আমাদেরকে নানারূপ নির্যাতন শুরু করে। আমরা তাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের পয়গাম্বরের আদেশে আপনার দেশে হিজরত করে এসেছি। এখন যদি আপনি আমাদেরকে এই কোরায়েশ দূতদের হাতে অর্পণ করেন তাহলে আমাদের আর কোন উপায় থাকবে না।

বাদশাহ হযরত জাফরের এই তেজস্বীনি ও হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য শুনে খুবই প্রীত হলেন এবং বললেন, তোমাদের পয়গাম্বরের উপরে যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু আমাকে শুনাতে পার? হযরত জাফর, হযরত ঈসা ও হযরত মরিয়ম সম্পর্কীয় সূরায়ে মরিয়মের কয়েকটি আয়াত সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে তাকে শুনালেন। নাজাশীর দু'চোখ গড়িয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি অন্তরে এক স্বর্গীয়-শান্তি অনুভব করলেন এবং বললেনঃ সৃষ্টিকর্তার শপথ ইঞ্জিল আর যে কালাম এখন আমাকে শুনান হল উভয়ই একই মূল হতে এসেছে।

অতঃপর তিনি কোরায়েশ দূতগণকে লক্ষ্য করে বললেনঃ ফিরে যাও আমি এ নিরপরাধ লোকগুলিকে তোমাদের হাতে অর্পণ করতে পারব না।

এদিকে কোরায়েশরা অধীর আগ্রহে দূতদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করেছিল তারা ভেবেছিল পলাতক লোকগুলোকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে দূতগণ মক্কায় ফিরবে। কিন্তু দীর্ঘ প্রতিক্ষার পরে দূতগণ যখন খালি হাতে ফিরে এল, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জানতে চাইল। দূতগণ বললঃ জাফরের মুখে কুরআন শুনেই বাদশাহ বিগড়ে গেলেন। নতুবা আমরা তাদেরকে ফেরত আনতে পারতাম।

কোরায়েশরা আর একবার অনুভব করল যে, কুরআনের অলৌকিক প্রভাবেই তাদের সর্বনাশের মূল কারণ। কুরআন শুনেই বাদশাহ বিগড়ে গেলেন। নতুবা আমরা তাদেরকে ফেরত আনতে পারতাম।

কুরআন শুনে কুরআনের অলৌকিক প্রভাবে অভিভূত হয়ে নবুয়তের প্রথম দিকে যারা ঈমান এনেছিলেন, তাদের ভিতরে দক্ষিণ আরবস্থ ইয়ামানী কবি তোফায়েল ইবনে দোসীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরবে তখন কবিদের যথেষ্ট মর্যাদা দেয়া হত। ফলে তোফায়েল ইবনে দোসীর ইসলাম গ্রহণে সারা আরব দেশে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে দোসী গোত্রে সমস্ত লোকই তার প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন।

বনি সলিম গোত্রের বিজ্ঞ ব্যক্তি কায়েস ইবনে নাসিরাও হুজুরের মুখনিঃসৃত কুরআন শুনে ইসলাম কবুল করেছিলেন। পরে তিনি বাড়ী ফিরে গিয়ে তার গোত্রের লোকদের একত্র করে বললেন, দেখ, রোম ও পারস্যের সেরা কবি সাহিত্যকদের কথাবার্তা ও রচনাদি শুনার ভাগ্য আমার হয়েছে, হামিরের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের কথাবার্তাও আমি ঢের শুনেছি। কিন্তু মুহাম্মদের মুখনিঃসৃত কুরআনের বাণীর সমতুল্য আমি কারো কাছেই কিছু শুনি নাই। পরবর্তী সময় তাঁর প্রচেষ্টায় তাঁর গোত্রের প্রায় এক হাজার লোক ইসলাম কবুল করেছিলেন।

আজাদ গোত্রের সর্দার জামাদ ইবনে সায়ালাবাও নবীর মুখে কুরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন। নেতৃস্থানীয় কোরায়েশ যুবকদের ভিতরে হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণও ছিল কুরআনের অলৌকিক প্রভাবে। ঘটনাটি ছিল নিম্নরুপঃ

নবুয়তের তখন নবম বর্ষ। আবু জাহেল দ্বারে-নোদ্য়ায়ে কোরায়েশ নেতাদের এক সম্মেলন ডাকল। অতঃপর সকলকে লক্ষ্য করে জ্বালাময়ী ভাষায় মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে একটি নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা করল। আর কোরায়েশ যুবকদের এই বলে উসকালো, এই একটি মাত্র লোক আমাদের জাতিধর্ম ইত্যাদি সবকিছু ওলট-পালট করে দিল। অথচ কেউ এ শত্রুকে নিপাত করতে পারল না। আমি আজ জনসমক্ষে ঘোষণা করছি, যে বীর যুবক মুহাম্মদের (সঃ) ছিন্ন মস্তক আমাদের কাছে হাজির করতে পারবে। আমি তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং একশত উট পুরস্কার দিব।

ঘোষনার সাথে সাথে উত্তেজিত জনতার ভিতর হতে বলিষ্ট দেহ বিশাল বক্ষ, যুবক ওমর নাংগা তলোয়ার হাতে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললঃ এই আমিই যাই, মুহাম্মদের ছিন্ন মস্তক না নিয়ে আর ফিরব না। জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল, আর মহাবীর ওমর তলোয়ার নিয়ে রওনা হলো।

পথিমধ্যে বন্ধু নঈমের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। নঈম ওমরের এই ক্রোধাবস্থা লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল- এ অসময় উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে তুমি কার সর্বনাশ করতে বের হয়েছো? বলল, মুহাম্মদের (সঃ) মস্তুপাত করতে। সে আমাদের সবকিছূই ওলট-পালট করে দিয়েছে।

নঈম যে গোপনে ইসলাম কবুল করেছিলেন, ওমর তা জানত না। নঈম রাসূলকে (সঃ) ওমরের আক্রোশ হতে বাঁচবার জন্যে বললেন, তোমার ভগ্নি ফাতেমা এবং ভগ্নিপতি সাঈদও যে ইসলাম কবুল করেছে। ওমর আঁতকে উঠে বললঃ হায়

সর্বনাশ! আমারই ঘরে? আমি এক্ষনই ঠিক করে দেব, এই বলে সে বোনের বাড়ীর দিকে রওনা হল।

তখন মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ। সাঈদ ও ফাতিমা কুরআনের লিখিত কিছু অংশ পাঠ করছিলেন। হঠাৎ ওমরের আগমনধ্বনি শুনে তারা তা লুকিয়ে ফেললেন। ওমর জিজ্ঞেস করলেন এই মাত্র কি পাঠ করছিলে। ফাতিমা বললেন, কই তুমি কি শুনেছ? ওমর ক্রোধভরে সাঈদের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে তাকে প্রহার শুরু করল। আর বলল, মুহাম্মদের দ্বীন কবুল করেছ, এবার মজা দেখে নাও। ফাতিমা ঠেকাতে গিয়ে আহত হল। তার জখম হতে রক্ত ঝরছিল। ওমর রক্ত দেখে থমকে দাঁড়াল এবং বলল, হতভাগিনী মুহাম্মদের (সঃ) দ্বীন কবুল করেছিস? ফাতিমাও ছিল মহাবীর খাত্তাবের মেয়ে। জখম হয়ে নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিলেন, তুমি যত পার মার। মুহাম্মদের (সঃ) দ্বীন কবুল করেছি, তা পরিত্যাগ করব না। বোনের এই কঠোর ও নির্ভীক উক্তিতে ওমর সচকিহ হল এবং বলল, তোমরা যা পাঠ করেছিলে তা আমাকে দাও। ফাতিমা উত্তর দিলেন আগে তুমি অজু করে পবিত্র হও তারপরে দেব। ওমর পবিত্র হওয়ার পরে তাকে তা দেয়া হল। এতে সূরায়ে ত্ব হার অংশ বিশেষ লেখা ছিল। ওমর মনোনিবেশ সহকারে তা পাঠ করল। অতঃপর তার ভাষা ও অন্তর্নিহিত ভাব ওমরকে একেবারেই অভিভূত করে ফেলল। সে একান্তভাবে অনুভব করল যে, এ কালাম কিছুতেই মানব রচিত নয়। কম্পিত কণ্ঠে ওমর ঘোষণা করলেন,

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল।

হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের খবর বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল। ওদিকে দ্বারে নোদওয়ায়ে মুহাম্মদের ছিন্ন মস্তক হস্তে মহাবীর ওমরের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায়

যারা ছিল, তাদের মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। তারা বুঝতেই পারল না যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটল, যার ফলে মাথা নিতে গিয়ে মাথা দিয়ে আসলো।

অনুসন্ধান করে জানল, বোনের বাড়ীতে কুরআন পাঠ করেই তাঁর এ দুর্দশা। কোরায়েশরা আর একবার চরমভাবে অনুভব করল যে, কুরআনই তাদের সব অঘটনের মূল।

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত জোবায়ের ইবনে মোতেমও কুরআন শুনে ইসলাম কবুল করেছিলেন। এসব ঘটনা দৃষ্টে কাফের ও মুশরেক নেতাদের আর বুঝতে বাকী থাকল না যে, কুরআনের কারণেই তাদের এ বিপর্যয়। মুহাম্মদ (সঃ) তো কুরআন নাযিলের আগেও তাদের ভিতরে ছিল। কিন্তু কই, তখন তো সে তাদের জাতি বা সমাজের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কুরআন অবতীর্নের পর হতেই তো তাদের এ বিপর্যয়। কুরআন শুনে উতবার মত প্রখর বুদ্ধিমান লোকটি বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। আবার এই কুরআনের আকর্ষণেই নাজ্জশী কোরায়েশ দূতদেরকে খালি হাতে ফেরত দিল, ওমরের মত পাষাণ হৃদয় কুরআনের যাদু স্পর্শে মাথা নিতে গিয়ে মাথা দিয়ে আসল। প্রসিদ্ধ কবি তোফায়েল-বিন দোসী, জামাদ, জোবায়ের প্রভৃতি গোত্র সর্দারগণ কুরআনের বাণীতে মুগ্ধ হয়েই ইসলামের কোলে আশ্রয় নিল।

সুতরাং কাফের সর্দারগণ পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তারা নিজেরাও কুরআন শুনবে না এবং কুরআনের আওয়াজ যাতে কোন লোকের কানে না পৌছে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আল্লাহ তাদের এ সিদ্ধান্তের কথা নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা রাসূলকে জানিলে দিলেন।

"وقال الذين كفروا من استمع للقرآن فحدث وهو يقرأ القرآن فقد نجح كيدك" لأذيقن هؤلاء الكافرين عذاباً شديداً ولأجزينهم جزاءً مناسباً على سيئاتهم

কুরআনের এই অলৌকিক প্রভাবের কথা স্বীকার করে প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পন্ডিত ইমানুয়েল ডুয়েৎচ বলেছেন, ”এই পুস্তকখানার সাহায্যেই আরবরা আলেকজান্ডার ও রোম অপেক্ষাও বৃহত্তর ভূ-ভাগ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। রোমের যত শত বছর লেগেছিল তাদের বিজয় সম্পূর্ণ করতে আরবদের লেগেছিল তত দশক। এরই (কুরআনের) সাহায্যে সমস্ত সেমিটিক জাতির মধ্যে কেবল আরবরাই এসেছিল ইউরোপের রাজারূপে। নতুবা ফিনিসীয়রা এসেছিল বনিক রূপে। আর ইহুদীরা পলাতক কিংবা বন্দীরূপে।

“আর কাফেররা বলে, কেহই কুরআন শুন না এবং কুরআন তেলওয়াতের সময় শোর-গোলকর, তাহলেই তোমাদের পরিকল্পনা কার্যকরী হবে। আমি এ সব কাফেরদেরকে কঠোর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করার এবং তাদেরকে এ অপকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল দেব। (সূরা হামিম সিজদা আয়াত নং ২৬,২৭)

কুরআন আমাদের বুঝতে হবে কেন?

কুরআন বুঝার পন্থা সম্পর্কে আলোকপাত করার আগে আমাদের বুঝতে হবে কুরআন বুঝার কেন এত গুরুত্ব। সেটিই নিচে তুলে ধরা হল।

কুরআন হচ্ছে দ্বীনের সকল জ্ঞানের উৎস এবং মৌলভিত্তির আধার। দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ এর মাধ্যমেই শুধু অর্জিত হয়। কুরআন নাযিল হয়েছে এর বিধান অনুযায়ী আ'মাল করার জন্য। আমলের জন্য বোঝা ও উপলব্ধির প্রয়োজন। না বুঝে আ'মাল করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে অথচ বুঝে না তার উদাহরণ হল যেমন একদল লোকের কাছে তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি নির্দেশিকা আসল, যাতে লিখা আছে কি করা যাবে আর কি করা যাবে না, কিসে তাদের মঙ্গল হবে এবং কিভাবে

ভুলপথে চললে শত্রু তাদেরকে পাকড়াও করবে, তারা সে নির্দেশিকা মাথায় রেখে খুবই সম্মান দেখাল এবং সুন্দর সুরে তা পড়ল কিন্তু বুঝার চেষ্টা না করে ভুল পথে চলল, ফলে অনিবার্যরূপেই তারা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হল।

কুরআনের অর্থ না বুঝার মানেই হল দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও ধারণা না থাকা। আবু দারদা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম, তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "এটা সে সময় যখন মানুষের কাছ থেকে জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, ফলে তারা তা অর্জন করতে সক্ষম হবে না।" তখন যিয়াদ ইবন লাবিদ আল-আনসারী বললেন, কিভাবে জ্ঞান আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে অথচ আমরা কুরআন পড়েছি? আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই কুরআন পড়ব, আর আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে কুরআন পড়াব। রাসূলুলাহ (স) বললেন, "হে যিয়াদ তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক (তোমার মৃত্যু হোক), (এটা কোন বদদোয়া নয়, বরং আরবী বাকরীতি। অপছন্দনীয় কিংবা সঠিক নয় এমন কথা বলা হলে আরবগণ এ বাক্য কিংবা 'ওয়াইলাক' (তোমার ধ্বংস) ব্যবহার করে থাকে।) আমি তো তোমাকে মদীনাবাসী ফকীহদের মধ্যে গণ্য করতাম। এ তাওরাত এবং ইনজিল ইয়াহুদ ও নাসারাদের কাছে আছে। কিন্তু তা তাদের কি কাজে এসেছে?" জুবায়ের বললেন, এরপর আমরা উবাদাহ ইবন আস-সামিতের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। আমি বললাম, তুমি কি শুনেছ তোমার ভাই আবু দারদা কি বলছে? আর আবুদ্দারদা কি বলেছে তা তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আবুদ্দারদা সত্য বলেছে, তুমি চাইলে আমি তোমার কাছে সে ইলম সম্পর্কে বলব যা সর্বপ্রথম উঠিয়ে নেয়া হবে, তা হল খুশু ও বিনয়। তুমি হয়ত কোন মাসজিদে প্রবেশ করে সেখানে কোন বিনয়ী লোক পাবে না। সুনান তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, বাব: ইলম উঠে যাওয়া প্রসঙ্গে যা এসেছে, হাদীস নং ২৬৫৩, তিরমিযী বলেন, 'এটি হাসান গরীব হাদীস'। আলবানী বলেন, 'সহীহ'।

অতএব বুঝা গেল যে, ইলম ও জ্ঞান উঠে যাওয়ার কারণই হল এমন ব্যক্তিগণের অভাব ও অনুপস্থিতি যারা ইলমকে ধারণ করবেন এবং সঠিকভাবে উপলব্ধি করবেন ও আ'মাল করবেন।

কুরআন বুঝা ও কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণার বিপুল সাওয়াব রয়েছে। উকবা ইবন আমের আল-জুহানী বলেন, আমরা আহলে সুফফার সাথে থাকাবস্থায় রাসূলুলাহ (স) একবার আমাদের কাছে এসে বললেন, "তোমাদের কোন ব্যক্তির এটা পছন্দ যে, সে আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়াই এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট না করে বুতহান অথবা আকীক প্রান্তরে (মদীনার দু'টো উপত্যকা) গিয়ে দু'টো বিশালকায় উট নিয়ে আসবে?" আমরা বললাম, আমাদের সবারই তা পছন্দ। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ প্রতিদিন মাসজিদে গিয়ে কিতাবুল্লার দু'টো আয়াত শেখা কিংবা পড়া দু' উটের চেয়েও তার জন্য উত্তম। আর তিনটি আয়াত তিনটি উটের চেয়ে এবং চারটি আয়াত চারটি উটের চেয়ে উত্তম। আর যতগুলো আয়াত সে অধ্যয়ন করবে তা সমসংখ্যক উটের চেয়ে উত্তম" (সহীহ মুসলিম, কিতাব: মুসাফিরদের স্বলাত ও এর কসর, বাব: কুরআন শেখা ও স্বলাতের মধ্যে কুরআন অধ্যয়নের ফযীলত, হাদীস নং ১৯০৯)।
যদি জ্ঞানার্জন সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাকর কাজ হয়ে থাকে তাহলে এর অগ্রভাগে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে আল্লাহর কালাম জানা, বুঝা ও উপলব্ধি করা। কেননা জ্ঞানের মর্যাদা জ্ঞানগত বিষয়ের মর্যাদার উপর নির্ভর করে। কিতাবুল্লাহ হচ্ছে জগতের সবচেয়ে সম্মানিত বিষয়; সুতরাং এর জ্ঞানার্জনই হল সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাকর কাজ।

মুসলিমদের অনৈক্য, ভুল বুঝাবুঝি ও হানাহানি দূর করে ভালবাসা, সম্প্রীতি ও হৃদ্যতা আনয়নের বিশুদ্ধ উপকরণই হল আল-কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা। কুরআনকে সঠিকভাবে না বুঝাই হল যত অনৈক্যের মূল। ইবরাহীম আত-তাইমী বলেন, 'ওমর (রা) একদিন একাকী ছিলেন, তিনি স্বগতোক্তি করে বললেন, কিভাবে এ উম্মতের মধ্যে বিভেদ থাকতে পারে, অথচ

তাদের নবী এক এবং কিবলা এক!? এরপর তিনি ইবন আব্বাস (রা)কে ডেকে পাঠালেন ও জিজ্ঞাসা করলেন, এ উম্মত কিভাবে বিভক্ত হতে পারে অথচ তাদের নবী এক ও কিবলা এক? ইবন আব্বাস বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমাদের উপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং আমরা তা অধ্যয়ন করেছি এবং জেনেছি কোন ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আর আমাদের পর একদল লোক আসবে যারা কুরআন পড়বে অথচ জানবে না কোন্ ব্যাপারে কুরআন নাযিল হয়েছে। ফলে সে ব্যাপারে তারা নিজস্ব মতামত দেবে। আর যখন তাদের নিজস্ব মতামত হবে তারা মতভেদ করবে এবং এভাবে মতভেদ করতে করতেই তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।"
-ইবরাহীম ইবন মুসা ইবন মুহাম্মাদ আশ-শাতিবী, আল-মুয়াফাকাত ফী উসূলিল ফিকহ, তাহকীক: মাশহুর হাসান সালমান, দার আফফান, ১৯৯৭, ৪/২০০।

কুরআন শেখা ও তা সঠিকভাবে বুঝা থেকে যারা বিরত থাকে ও মুখ ফিরিয়ে রাখে তারা মূলত কুরআনী জীবন যাপন থেকে সরে গিয়ে অন্য জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে জানিয়েছেন, যাদের কাছে কুরআনের জ্ঞান এসেছে অথচ সে জ্ঞান থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ও তা পরিত্যাগ করেছে, তাদেরকে তিনি জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত করেননি, বরং অজ্ঞানতার মধ্যেই তারা হাবুডুবু খেয়েছে।

وَ لَمَّا جَآءَهُمۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمۡ نَبَذَ فَرِيۡقٌ مِّنَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ ٭
كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوۡرِهِمۡ كَاَنَّهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ- وَ اتَّبَعُوۡا مَا تَتۡلُوا الشَّيٰطِيۡنُ عَلٰى مُلۡكِ سُلَيۡمٰنَ ج

"আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর কাছ থেকে একজন রাসূল এলো, তাদের সাথে যা আছে তা সমর্থন করে, তখন আহলে কিতাবের একটি দল আল্লাহর কিতাবকে তাদের পেছনে ফেলে দিল, (এভাবে যে,) মনে হয় যেন তারা জানে না। আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বে পাঠ করত।" -(সূরা আল-বাকারাহ: ১০১-১০২)

ইয়াহুদিদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব আসার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল বলে আল্লাহ তাদেরকে এমন এক নিকৃষ্ট গ্রন্থের ফিতনায়

তাদেরকে আক্রান্ত করেছিলেন যা সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বে শয়তান তিলাওয়াত করতো।

-(আবদুর রহমান ইবন সা'দী, আল-কাওয়ায়েদ আল-হিসান, ৩৪নং ধারা)

আলাহ কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার শাস্তি সম্পর্কে বলেন- وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.

"*আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জন্য হবে নিশ্চয়ই এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাব অন্ধ অবস্থায়।"(*সূরা ত্বহা-১২৪)

তিনি আরো বলেন-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ.

"*আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যাকে স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? নিশ্চয় আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধগ্রহণকারী।*" (সূরা আস-সাজদাহ: ২২)

মহান আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনকে মানবজাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে নাজিল করেছেন। আল-কুরআন মানুষকে দুনিয়ায় শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন ও আখিরাত জীবনের সফলতার পথ দেখায়।

তাই আমরা নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করব। কুরআনের অর্থ ও ভাব অনুধাবন করব এবং কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করব। কুরআনে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পড়া, বোঝা এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তাওফিক দান করুন। আমিন।

কুরআন শিক্ষায় করণীয়

১.ভাল শিক্ষকের কাছে পড়া:

যিনি সহীহভাবে কুরআন পড়তে পারেন তার নিকটই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে যে শিক্ষকের কুরআন শিক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ আছে তার কাছে পড়লে আরো ভাল হয়।

২.নিয়মিত পড়া :

সহীহভাবে কুরআন শিক্ষার জন্য নিয়মিত সময় দেয়া দরকার। যদিও কম সময় হয়। প্রতিদিন শেখার মধ্যে থাকলে সহীহভাবে কুরআন শিক্ষা সহজ হবে এবং যা শেখা হবে তা আয়ত্ত্বে থাকবে।

৩.মশক করা :

কোন যোগ্য শিক্ষকের কাছে মশক করলে পড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। মশক হলো- শিক্ষক পড়বে তারপর সেভাবে ছাত্রও পড়বে। এ ছাড়া বিভিন্ন সিডির মাধ্যমেও মশক করা যায়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত ক্বারী মানশাওয়াভীর কুরআন প্রশিক্ষণ সিডির সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

৪.পরিবার পরিজন ও সন্তানদের শিক্ষা দেয়া:

প্রত্যেক মুসলিমকে তার পরিবার পরিজন ও সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কুরআনে এসেছে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ﴾ [التحريم: ٦]

“হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও”। (সূরা তাহরীম-৬)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

কুরআনের বিষয়ে তোমাদের উপর অবশ্য পালনীয় এই যে, কুরআন শিক্ষা করা এবং তোমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া। কেননা এ বিষয়ে
তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার প্রতিদানও দেয়া হবে। (শরহে সহীহ বুখারী, ইবন বাত্তাল : ৪৬)

৫.ফযিলাতপূর্ণ সূরাগুলো বেশী বেশী করা :
ফযীলতপূর্ণ সূরাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা করা এবং সেগুলো বেশি বেশি তিলাওয়াত করা। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

»أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِى لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. قَالُوا :وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالَ : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ«.

‘তোমাদের কেউ কি রাত্রিকালে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াতে অক্ষম? তারা বললেন, কুরআনের এক তৃতীয়াংশ কিভাবে পড়া পড়বে তিনি বললেন, (সূরা ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য’ [সহীহ বুখারী: ৫০১৫] ।
অতএব যেসব সূরা ও আয়াত সম্পর্কে অধিক ফযীলত ও বেশি নেকীর কথা বর্ণিত হয়েছে এবং যেগুলো ভালোভাবে শেখা ও বেশি বেশি পড়া দরকার তার মধ্যে রয়েছে, শুক্রবার ফজর নামাজে সূরা আলিফ-লাম-সিজদাহ পড়া, ঘুমানোর আগে সূরা মুলক এবং ফরয নামাজের পর সূরা নাস, সূরা ফালাক ও আয়াতুল কুরসী পড়া।

কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত ও সূরার বিশেষ ফজীলত

বিশুদ্ধভাবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে পারা মুমিনের জীবনে পরম সৌভাগ্য। এ সৌভাগ্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক মহাদান। কুরআন মাজীদে এক শ চৌদ্দটি সূরা এবং ছয় হাজার দুই শ ছত্রিশটি আয়াত রয়েছে। কুরআনের প্রতিটি সূরা, প্রতিটি আয়াত এবং প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতের সওয়াব ও ফযীলতের পাশাপাশি কিছু আয়াত ও সূরার বিশেষ কিছু ফযীলতের কথাও উল্লেখিত হয়েছে হাদীস শরীফে। তন্মধ্য থেকে কয়েকটি আয়াত ও সূরার ফযীলত এখানে আলোচনা করা হল:

১.সূরা ফাতিহা

আবু সায়ীদ ইবনুল মুআল্লা রা. বলেন, আমি একদিন মসজিদে নামায পড়ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন-

لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

তুমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই তোমাকে এমন একটি সূরা শেখাব, যা কুরআন মাজীদের সবচে মহান সূরা।... এরপর বললেন, (সেটি হল) আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা)। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৪৭৪

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

ইমাম যখন বলেন-

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ.

তখন তোমরা 'আমীন' বল। (কেননা ফেরেশতারাও তখন আমীন বলে) যার আমীন বলা ফেরেশতাদের বলার সাথে মিলে যাবে তার অতীত জীবনের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৮২, ৬৪০২

২.আয়াতুল কুরসী

উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আবুল মুনযিরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল মুনযির, তুমি কি জানো আল্লাহর কিতাবের যে আয়াতগুলো তুমি হিফয করেছ তার মধ্যে কোন্ আয়াত শ্রেষ্ঠ?

আবুল মুনযির বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

তিনি আবার বললেন, হে আবুল মুনযির, তুমি কি জানো আল্লাহর কিতাবের যে আয়াতগুলো তুমি হিফয করেছ তার মধ্যে কোন্ আয়াত শ্রেষ্ঠ?

তখন আমি বললাম-

اَللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْم...

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে চাপড় দিয়ে বললেন, ইলম তোমার জন্য সহজ হোক হে আবুল মুনযির। -(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১০)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে এসেছে, এক আগন্তুকের সাথে তার কথোপকথন হল। একপর্যায়ে সে বলল-

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.

তুমি রাতে যখন ঘুমাতে যাবে, আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন হেফাযতকারী ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকবেন। ফলে শয়তান তোমার কাছেও ভিড়তে পারবে না।

পুরো ঘটনা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ.

সে ছিল (ইবলিস) শয়তান। সে মিথ্যুক হলেও কথা সত্য বলেছে। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১০)

৩.সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় ওপরের দিক থেকে দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে তিনি মাথা উঠালেন। তখন জিবরাঈল আ. বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা। আজই প্রথম খোলা হল। আগে কখনো এ দরজা খোলা হয়নি।

সেখান থেকে একজন ফেরেশতা নেমে এলেন।
তিনি বললেন, এই ফেরেশতা আজকের আগে আর কখনো পৃথিবীতে আসেননি।

ফেরেশতা সালাম দিয়ে বললেন-

أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ.

আপনি এমন দুটি আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা শুধু আপনাকে দেওয়া হয়েছে। আপনার পূর্বে আর কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষাংশ। আপনি এর যেকোনো হরফ পড়বেন তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেওয়া হবে। -(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৬)

হযরত আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পড়বে তার জন্য তা (রাতের আমল হিসেবে এবং সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে) যথেষ্ট হবে। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০০৯)

৪.সূরা কাহফ

আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে দাজ্জালের ফেতনা থেকে সে মুক্ত থাকবে। -(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৩২৩)

অন্য বর্ণনায় সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত সম্পর্কে এই ফযীলতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৮৬)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ِمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ তিলাওয়াত করবে, তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত একটি নূর বেষ্টন করে রাখবে। -(মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৩৩৯২; সুনানে কুবরা বাইহাকী, হাদীস ৫৯৯৬)
হাদীসটির সনদ হাসান

৫.সূরা ইয়া সীন

জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেন-

ُمَنْ قَرَأَ يٰسٓ فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ غُفِرَ لَه.

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য রাতের বেলা সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। -(সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৫৭৪, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৫৬২)
হাদীসটি সালিহ লিল আমাল

আতা ইবনে আবী রাবাহ রাহ. বলেন, আমার কাছে এই হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ يٰسٓ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قُضِيَتْ حَوَائِجُه.

(إسناده إلى عطاء صحيح)

যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে সূরা ইয়া সীন তিলাওয়াত করবে তার যাবতীয় প্রয়োজন পুরা করা হবে। -(সুনানে দারেমী ২/৫৪৯)

৬.সূরা মুলক

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً، تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে। যে ব্যক্তি নিয়মিত সেই সূরা তিলাওয়াত করবে তার জন্য ক্ষমা আদায় করা পর্যন্ত সূরাটি সুপারিশ করতে থাকবে। সেই সূরা হল, 'তাবারাকাল্লাযি বিইয়াদিহিল মুলক'। -(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪০০; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮৯১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৮৭)

ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هِيَ إِلَّا ثَلَاثُونَ آيَةً، خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتَّى أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ.

কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে। নিয়মিত যে ব্যক্তি সেই সূরা তিলাওয়াত করবে তার পক্ষে সে তর্ক করবে। একপর্যায়ে তাকে জান্নাতে নিয়ে

যাবে। সেটি হল সূরা মুলক। -(আলমুজামুল আউসাত তবারানী, হাদীস ৩৬৫৪; আলআহাদীসুল মুখতারাহ লিল মাকদিসী, হাদীস ১৭৩৮)
হাদীসটি হাসান।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

مَنْ قَرَأَ تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مَنَعَهُ اللهُ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَكُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّيهَا الْمَانِعَةَ، وَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ مَنْ قَرَأَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ.

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা মুলক পড়বে আল্লাহ তাআলা তাকে এর ওসিলায় কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় এই সূরাকে আমরা বলতাম- ‘মানেআ’ অর্থাৎ কবরের আযাব প্রতিরোধকারী। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে এই সূরা তিলাওয়াত করল সে অনেক তিলাওয়াত করল এবং উত্তম কাজ করল। -(সুনানে কুবরা নাসায়ী, হাদীস ১০৫৪৭; আলমুজামুল কাবীর তবারানী, হাদীস ১০২৫৪; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৩৮৩৯)
হাদীসটি হাসান।

সূরা ইখলাস

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন-

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ.

তোমাদের কেউ কি রাতের বেলা কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে পারবে?
বিষয়টি তাঁদের কাছে কঠিন মনে হল।

তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কে তা পারবে?

তখন তিনি বললেন-

ِاللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآن.

অর্থাৎ সূরা ইখলাস কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ (তিলাওয়াতের সমান)। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১৫)

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ.ِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন বিছানায় আসতেন, (ঘুমানোর আগে) সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে দুই হাতের তালুতে (একত্র করে) ফুঁ দিতেন। এরপর সেই দুই হাতে চেহারা ও পুরো শরীর যতদূর সম্ভব মুছে নিতেন। আয়েশা রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে গেলে আমাকে আদেশ করতেন, আমি তা (সূরাগুলো পড়ে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে শরীর মোছার কাজ) করে দিতাম। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৪৮)

অন্য রেওয়ায়েতে আছে-

يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.ٍ

দুই হাতে পুরো শরীর যতদূর সম্ভব মুছে নিতেন। মোছা শুরু করতেন মাথা চেহারা ও শরীরের সম্মুখভাগ থেকে। তিনবার এমন করতেন। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১৭)

আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস সকাল সন্ধ্যা তিনবার করে পড়লে তা তোমার জন্য সকল সমস্যা ও অনিষ্ট থেকে (রক্ষার ক্ষেত্রে) যথেষ্ট হবে। -(জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৮২)

হাদীসটি হাসান।

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার গুরুত্ব :

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা জরূরী। কুরআন তেলাওয়াতের সময় মাখরাজ সমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ না করলে বা তাজবীদের নিয়ম সমূহ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ না করলে অনেক সময় আয়াতের মর্ম পরিবর্তন হয়ে যায়। যাতে পাপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব ধীরে-সুস্থে ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা জরূরী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً- *'আর কুরআন তেলাওয়াত কর ধীরে ধীরে, সৌন্দর্যমন্ডিত পন্থায়'* (মুযযাম্মিল ৭৩/৪)।

তিনি আরও বলেন, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً- '

আর আমরা তোমার উপর পর্যায়ক্রমে সুন্দরভাবে কুরআন নাযিল করেছি' (ফুরক্বান ২৫/৩২)।

তারতীল সহকারে তিলাওয়াত করা

ِتَتَرْتِيْلُ قُرْآن : এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা। (মুফরাদাত)

তারতীল সহকারে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন: ًوَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا.

" *আর কুরআনকে তারতীল করো তারতীল করার মতো।"* (সূরা আল মুযায্যাম্মিল, ৭৩:৪)

'আল-মা'আরিফ গ্রন্থকার তারতীলের অর্থ প্রসঙ্গে বলেন : তারতীল শব্দের অর্থ হলো- শব্দসমূহকে সহজভাবে ও ধীরস্থিরভাবে মুখ হতে বের করা। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে কুরআন তিলাওয়াতের সময় তাড়াহুড়া করবে না; বরং সহজভাবে উচ্চারণ আদায় করবে তার সাথে সাথে তার অর্থ ও মর্মের প্রতি মনোনিবেশ করবে।

জালালাইন গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে বলেন: ধীরগতিতে আগ্রহের সাথে তাড়াহুড়া না করে পড়বে, যাতে শ্রোতাবৃন্দ আয়াতসমূহ ও শব্দসমূহ বুঝতে সক্ষম হয়।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত না করা এবং সহজভাবে অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে উচ্চারণ করা। (কুরতুবী)

হযরত উম্মে সালমা বলেন: রাসূল (সা:)-এর কিরাত স্পষ্ট ছিল। (মাযহারী) সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করাও তারতীলের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন: রাসূল (সা:) সশব্দে সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করতেন। তাঁর তিলাওয়াতের মত অন্য কারো তিলাওয়াত আল্লাহ তা'আলা শুনেননি। (মাযহারী)

হযরত আলকামা (রা) এক ব্যক্তিকে সুমধুর স্বরে তিলাওয়াত করতে দেখে لَقَدْ رَتَّلَ الْقُرْآنَ نَدَاهُ أَبِي وَأُمِّي : বলেছেন, আমার পিতামাতা তার জন্য উৎসর্গ হোন। (কুরতুবী)

তবে পরিস্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করে উহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তারতীল। হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা:) এক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করতে দেখে বলেছিলেন -আল্লাহ তা'আলা وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا : আয়াতে যে তারতীলের কথা বলা হয়েছে এটাই সে তারতীল। (কুরতুবী)

অর্থ ও তাৎপর্যের প্রতি মনোনিবেশ করে কুরআন পাঠ করাকে তারতীল বলা হয়। (তাফসীরে খাযেন)
থেমে থেমে ধীরে সুস্থে কুরআন পড়। এতে কুরআনের মর্ম উপলদ্ধি করতে পারবে এবং কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে সুবিধা হবে। (ইবনে কাসীর)
নামাযে থেমে থেমে কুরআন তিলাওয়াত কর। (তাদাব্বুরে কুরআন)
কুরআন ধীরে সুস্থে থেমে থেমে তিলাওয়াত কর, যাতে করে একেকটি শব্দ স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এ রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত করলে তা বুঝতে ও অনুধাবন করতে সহজ হয়, তাতে মনের ওপর ক্রিয়া করে এবং হৃদয়ের আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। (তাফসীরে উসমানী)

তারতীল সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বলেন: একবার রাসূল (সা:)-কে তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: স্পষ্ট করে পাঠ করো। গদ্যের মত গড় গড় করে কিংবা পদ্যের মত টেনে হিঁচড়ে

পড়োনা। কুরআনের প্রতিটি বিস্ময়কর আয়াত পাঠ করে থামো, তার দ্বারা হৃদয়কে আন্দোলিত করো। কোন একটি সূরা দ্রুত পাঠ করে শেষ করাটাই যেন তোমার উদ্দেশ্য না হয়। (দুররে মনছুর, তাফহীমুল কুরআন)

কুরআন তেলাওয়াতের আদব

১. প্রাথমিক আদব : কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে ইখলাসের সাথে পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ মন নিয়ে। 'মুসহাফ' নিয়ে বসলে অযু করে পবিত্র হয়ে বসাটাই সর্বোত্তম, কেননা কুরআন তেলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত। তেলাওয়াত শুরুর পূর্বে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম' পাঠ করে শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাইতে হবে। (নাহল ৯৮)। অতঃপর কোন সূরার শুরু থেকে হলে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করতে হবে, নতুবা 'আউযুবিল্লাহ'ই যথেষ্ট। মসজিদে বা পবিত্র কোন জায়গায় বসে তেলাওয়াত করতে হবে। তবে এমনিতে দাড়িয়ে, শুয়ে, আরোহী হয়ে সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা যায় (আলে ঈমরান ১৯১)।

২. তেলাওয়াতের সময় অন্তরকে একনিষ্ঠ করতে হবে : তেলাওয়াত করার সময় অন্তরকে আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠভাবে রুজূ' করে দিতে হবে। কেননা ইবাদতের মূল হল খুলূছিয়াত বা একনিষ্ঠতা (বাইয়েনাহ ৫, ফুছছিলাত ১৪)।
রাসূল (সা:) বলেন, اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَه

'তোমরা কুরআন পড় এবং এর বিনিময় আল্লাহর কাছে কামনা কর, ঐ সম্প্রদায় আসার পূর্বেই, যারা কুরআনকে তীর রাখার মত করে রাখবে। তারা কুরআন থেকে পরকালীন লাভের পরিবর্তে দুনিয়াবী লাভ আশা করবে। (আহমাদ হা/১৪৮৫৫, ছহীহ)।

৩. কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে তাজবীদ সহকারে : কুরআন ধীরে-সুস্থে তারতীলসহ পড়া অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'এবং তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর তারতীল সহকারে' (মুযাম্মিল ৩)।

রাসূল (সা:) ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে তেলাওয়াত করতেন, কোন তাড়াহুড়া করতেন না (আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২০৫, সনদ সহীহ)।

রাসূল (সা:) আরো বলেন, زيّنوا القرآن بأصواتكم 'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর সুন্দর কণ্ঠে (আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত হা/২১৯৯, সহীহ)।

বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা:)-এর চেয়ে সুমধুর কণ্ঠে তেলাওয়াত আর শুনিনি (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৪)।

ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে বালুর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে না আবার সঙ্গীতের মত উচ্চ বা হ্রস্ব সুরে ঝুলিয়ে পড়বে না বরং পড়ার সময় কুরআনের মু'জিযাকে থেমে থেমে অনুধাবন করবে এবং অন্তরকে আন্দোলিত করে পড়বে।

৪. অর্থ বুঝে পড়তে হবে : পবিত্র কুরআন বুঝে পড়া আবশ্যক। কারণ কুরআন নাযিল করা হয়েছে যেন জ্ঞানীরা তাতে চিন্তা-ভাবনা করে। পবিত্র কুরআনে বারবার কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে। অর্থ না বুঝলে অনুবাদের সহযোগিতা নিয়ে যথাসম্ভব বুঝার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা কুরআন নাযিলের মৌলিক উদ্দেশ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। ছাহাবায়ে কেরাম সাধারণতঃ দশটি আয়াতও অতিক্রম করতেন না যতক্ষণ তাতে কি রয়েছে তা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ না করতেন এবং তা আমলে পরিণত না করতেন। রাসূল (সা:) কুরআন তেলাওয়াত করার সময় এতটাই একনিষ্ঠতা নিয়ে পড়তেন যে, যখন কোন তাসবীহের আয়াত আসত, তিনি মনে মনে তাসবীহ পড়তেন; প্রার্থনার আয়াত আসলে প্রার্থনা করতেন এবং আশ্রয় প্রার্থনামূলক আয়াত আসলে আশ্রয় চাইতেন। (নাসাঈ হা/১৬৬৪, ছহীহ)।

৫. অন্তরকে বিগলিত করে পড়তে হবে : কুরআন তেলাওয়াতের সময় রাসূল (সা:) এতটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন যে, কান্নায় তার বক্ষদেশ থেকে ফুটন্ত পানির মত শব্দ হত। (আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০০)।

আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ

'আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুসজল হচ্ছে, কারণ তারা সত্য হতে জেনেছে।(মায়েদা ৮৩)।'

৬. তেলাওয়াত শ্রবণে একাগ্রতা : রেডিও-টিভিতে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের সময় গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে তা শুনতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে একদিন রাসূল (সা:) বললেন, আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও। আমি বললাম, আপনার উপরই কুরআন নাযিল হয়েছে, আর আমি আপনাকে পড়িয়ে শোনাব? রাসূল (সা:) বললেন, আমি অন্য কারো কাছ থেকে কুরআন পড়া শুনতে ভালবাসি। অতঃপর আমি সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। যখন আমি ৪৪ নং আয়াতে পৌঁছলাম, রাসূল (সা:) আমাকে থামিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম, আয়াতটি শ্রবণে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় ক্রন্দনধারা ঝরছে (বুখারী(

কুরআন সম্পর্কে উদাসীনতা এবং এর ভয়াবহ পরিণাম

অধিকাংশ মানুষই আজ কুরআন শিক্ষা থেকে উদাসীন। বড়রা ব্যস্ত দুনিয়া আর দুনিয়াদারি নিয়ে। ছোটরা ব্যস্ত স্কুলের রুটিন নিয়ে যেখানে কুরআন শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয় না। যথাযথ যত্নও নেয়া হয় না। শিক্ষকরাও তাদের প্রতি কাম্য দায়িত্ব পালন করেন না। আর তাদের অবশিষ্ট সময় অপচয় হয় রাস্তা-ঘাটে খেলাধুলার পেছনে। ফলে তারা কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে বেড়ে উঠছে। তাই দেখা যায় বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে বড় হচ্ছে অথচ শুদ্ধভাবে আল্লাহর কিতাবের একটি

আয়াতও পড়তে পারে না। এজন্যই দেখা যায় গ্রামাঞ্চলের অনেক মসজিদেই এখনো শুদ্ধ তিলাওয়াত করতে পারে এমন ইমাম পাওয়া যায় না। আর এসবের প্রধান কারণ সন্তানদের কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে পিতামাতাদের অবহেলা। এদিকটিকে তাদের যথাযথ গুরুত্ব না দেয়া। তারা জানেন না তাদের সন্তান কুরআন পড়তে পারে কি-না। এমনি আজ অধিকাংশ মুসলিমই কুরআনকে ছেড়েই দিয়েছেন। দেখুন আল্লাহর নবী এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কাছে কীভাবে অভিযোগ করছেন -

১. রাসূল (সা:)-এর অভিযোগ পেশ : কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে রাসূল (সা:) উম্মাতের জন্য শাফা'আত করবেন। কিন্তু যারা কুরআন শিক্ষা করেনি, কুরআনের যেসব হক্ব রয়েছে তা আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন নবী (সা:) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করবেন। কুরআনে এসেছে, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا
‘ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

"*আর রাসূল বলবেন, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে"*।(ফুরকান ৩০)

ইবন কাছীর বলেন, কুরআন না পড়া, তা অনুসারে আমল না করা, তা থেকে হেদায়াত গ্রহণ না করা, এ সবই কুরআন পরিত্যাগ করার শামিল। (৬/১৮৮ পৃঃ)

২. কিয়ামত দিবসে অন্ধ, মূক ও বধির হয়ে উঠবে : যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে থাকল, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন অন্ধ, মূক ও বধির হয়ে উঠবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى

'আর যে আমার যিকর (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থয় উঠাব। সে বলবে, হে আমার রব! কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন? তিনি বলবেন, অনুরূপভাবে তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল'। (ত্বহা ১২৪-১২৬)

আল্লাহ আরো বলেন, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

'আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায়, বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখন জাহান্নামের আগুন নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নির দাহিকাশক্তি আরও বাড়িয়ে দেবো'। (বনী-ঈসরাইল ৯৭)।

৪. গাফেল হিসাবে চিহ্নিত হবে : কুরআন শিক্ষা না করা ব্যক্তি গাফেল। কুরআনের ভাষায় তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত অজ্ঞানতা ও মূর্খতার মাঝে নিমজ্জিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُون '

"এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বরং এরা তাদের চেয়েও আরো অধম ও নিকৃষ্ট। এরাই হল গাফেল"।(আরাফ ১৭৯)।

৫. কুরআন বিরোধী দলীল হিসাবে উপস্থাপিত হবে : কুরআন শিক্ষা থেকে বিরত থাকার কারণে কুরআন তার বিপক্ষের দলীল হিসাবে উপস্থিত হবে। রাসূল (সা:) এরশাদ করেছেন, وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْك 'কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষের দলীল (মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১)।

৬. জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে : কুরআন শিক্ষা না করা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে। রাসূল (সা:) বলেন, الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ومَاحِلٌ مُصَدَّقٌ ، فَمَنْ جَعَلَهُ ِإمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ قَادَهُ إِلَى النَّار 'কুরআন সুপারিশকারী এবং তাঁর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। কুরআন বিতর্ককারী এবং তার বিতর্ক সত্যায়ন করা হবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনকে সামনে রেখে তাঁর অনুসরণ করবে, কুরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি একে নিজ পশ্চাতে রেখে দিবে, কুরআন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে' (ছহীহ ইবনে হিববান হা/১২৪)।

৭. আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে : কুরআন শিক্ষা না করলে এ বিষয়ে আখেরাতে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ َلَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُون

'নিশ্চয় এ কুরআন তোমার জন্য এবং তোমার কওমের জন্য উপদেশ। আর অচিরেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (যুখরুফ ৪৪)

উপসংহার

কুরআন কোন বিশেষ শ্রেণির পাঠ্য বই নয় বরং সকল শ্রেণির বিশেষভাবে মেধাবী উচ্চ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান চৌকস, দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বেশি বেশি অধ্যয়ন করতে হবে। নালায়েক লোকদের হাত থেকে কুরআনকে বের করে শিক্ষার সকল স্তরে সিলেবাস ভুক্ত করতে পারলে কুরআনের আলোকে অল্প সময়ের মধ্যে লোকেরা আলোকিত হতে পারবে। সমাজকে আলোকিত করা যাবে।

কুরআন চর্চাকারীর এতই মর্যাদা যিনি কুরআনের উপর অভিজ্ঞ ও দক্ষ তাঁর মর্যাদা কিরামান কাতেবীন ফেরেশতার মত, আবার যিনি দক্ষ নন ঠেকে ঠেকে কুরআন শিখছেন তাকে দ্বিগুণ নেকী দেয়া হবে। একটি নেকী হচ্ছে তেলাওয়াত

করার জন্য অন্যটি হচ্ছে আন্তরিকতার সাথে শিখছেন অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে তোতলাচ্ছেন তোতলানীর জন্যও নেকী দেয়া হবে। (সুবাহানাল্লাহ)
পরিশেষে বলা যায় যে, যথাযথভাবে কুরআন শিক্ষা করা ও সুন্দরভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা মুমিনের জন্য জরূরী। প্রতিদিন কমপক্ষে দুই পৃষ্ঠা ও রামাদানের প্রতিদিন কমপক্ষে এক পারা কুরআন তেলাওয়াত করা কর্তব্য। যা মুখস্থ আছে তা সংরক্ষিত রাখা ও আয়াতগুলির অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা, সেইসাথে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সার্বিক জীবন গঠন করা কর্তব্য। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন